“নোয়াখালির ধ্বংসকান্ড”

১০’ই অক্টোবর ১৯৪৬-এর কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে শুরু হওয়া “নোয়াখালী হিন্দু-গণহত্যা” শুরু হবার মাত্র ৯ দিনের মাথাতেই সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নোয়াখালীর সেই মৃত্যুপুরীতে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে যান তৎকালীন “আনন্দ বাজার পত্রিকা”র মুখ্য সম্পাদক শ্রী চপলাকান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়। উপরিউক্ত “নোয়াখালির ধ্বংসকান্ড” শীর্ষক পুস্তিকায় তাঁর আঁকা সে দিনের সেই অমূল্য এবং ভয়াবহ চিত্রগুলি জাতীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

#Noakhalir_Dhongsokando," by #Shri_Chapalakanta_Bhattacharyya is now a forgotten treatise on HINDU GENOCIDE IN NOAKHALI. The Left in power, and the 'Raj' of the ‘Sarkars’, has successfully removed his name from the psyche of Bengal as he was a staunch fighter for the rights of tortured Hindu. A very close friend of the great Shyamaprasad, Bhattacharyya was the Chief Editor, Anandabajar Patrika who took the circulation of this vernacular daily to its peak. He was also a three times M.P.(Congress Party) from Bengal, Founder and Dean of Journalism Department, Calcutta University. Bhattacharyya wrote this extensive report on the Hindu Massacre in Noakhali. The book was initially banned by Government which was later lifted. This book is now unavailable & unfortunately the last few pages have not been found.]

কৃতজ্ঞতাঃ অধ্যাপক শ্রী Arijit Bhattacharyya...
সঙ্কলনঃ শ্রী নিহারণ প্রহারণ ....

ভূমিকাঃ

“নোয়াখালির ধ্বংসকান্ড” সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইতে হইতে তৎকালীন বাঙলা গভর্ণমেন্টের আদেশের ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১৯৪৭ সালের ৩০শে মে তারিখে মিঃ সুরাবর্দীর পরিচালিত বাঙলা গভর্ণমেন্ট নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের’ কয়েকটি সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করেন এবং উভয় সংবাদপত্রের ৭০০০ টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করিয়া পুনরায় ১৭০০০ টাকা নূতন জামানত আদায় করেন। ফলে, প্রবন্ধ প্রকাশ এবং প্রবন্ধসমূহের পুস্তকাকারে প্রকাশ বন্ধ হয়। বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের পরিচালিত পশ্চিম বাঙলা গভর্ণমেন্ট এক আদেশ জারী করিয়া (আঃ বাঃ পত্রিকা ২০/১/৪৮) পূর্ব্ব গভর্ণমেন্টের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেন। তাহার ফলেই বর্তমান গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। নোয়াখালি-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-প্রকাশ যখন তৎকালীন গভর্ণমেন্টের আদেশের ফলে বন্ধ হইয়া যায় তখন হইতে পুনঃ পুনঃ এই চিন্তাই মনে উঠিয়াছে, বর্তমানকালের বাঙলাদেশে যে এইরূপ ব্যাপার ঘটা সম্ভব হইয়াছিল ভবিষ্যৎকালের জন্য তাহার কিছু একটা ইতিহাস রক্ষিত হওয়া উচিত। সে চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা এতদিনে ফলবতী হইয়াছে। যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সরকারী আদেশের ফলে যাহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই সমস্তই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল। প্রবন্ধ গুলি যাহাতে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তজ্জন্য, প্রবন্ধ-প্রকাশের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্যন্ত, বাঙলাদেশ হইতে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান হইতে বহু অনুরোধপত্র পাইয়াছি; সাক্ষাৎভাবেও অনেকে ইহার জন্য আগ্রহ জানাইয়াছেন। কিন্তু এত অনুরোধ ও আগ্রহ সত্ত্বেও গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারি নাই, কারণ উহা সম্ভব ছিল না। আজ গ্রন্থ-প্রকাশের প্রাক্কালে তাহাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

যে প্রেরণা লইয়া নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনাসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অপ্রত্যাশিত ও কল্পনাতীত ভয়াবহ বর্বর ঘটনা মনকে রূঢ়ভাবে আঘাত করিয়া সদ্য সদ্য যে চেতনা ও চিন্তা জাগাইয়াছিল আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাই। কিন্তু গ্রন্থপ্রকাশের প্রেরণা ঐতিহাসিক। নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনা সাম্প্রদায়িক অগ্ন্যুৎপাতের আকারে দেখা দিয়াছিল বটে কিন্তু এখন উহা ইতিহাসের পর্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। ঘটনার পর আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে চলিল। ঘটনার সমকালে যে দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়া লোকে উহা দেখিয়াছিল এবং জনসমাজে উহা যে মনোভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল এখন আর তাহা বর্ত্তমান নাই। এখন ইতিহাসের দৃষ্টি ও মনোভাব লইয়াই লোকে উহা দেখিবে ও পর্যালোচনা করিবে। উহাকে এখন আর কেহ মাত্র সাম্প্রদায়িক কাণ্ড বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া দেখে না। পরবর্তী কালের ঘটনাসমূহের বৃহত্তর পটভূমিকায় উহা এখন সমসাময়িক ইতিহাসের অঙ্গ ও অংশ হইয়া গিয়াছে।

মুক্তিসাধনা ও গৃহযুদ্ধঃ

সে ইতিহাস কি এবং কিসের? পরাধীন জাতির মুক্তিসাধনার জন্য, স্বৈরাচারী শাসকের কবল হইতে জনগণের মুক্তি অর্জনের জন্য যে সকল স্তরের মধ্য দিয়া যাইতে হয় তাহাতে Civil War বা গৃহযুদ্ধ অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন পর্যায়ে দেখা দিয়া থাকে। নিতান্ত সৌভাগ্য না হইলে কোন দেশ ইহা হইতে অব্যাহতি পায় না। অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই ইহা ঘটিয়াছে এবং আমাদের দেশেও ইহার ব্যতিক্রম হইল না। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে ইতিহাস যে সাক্ষ্য বহন করিতেছে ভারতবর্ষকে তাহা হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য মহাত্মাজী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত দূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া দেশের রাজনৈতিক মুক্তিসাধনার জন্য অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের পথে গৃহযুদ্ধ আসিয়া পড়িবে বলিয়া মহাত্মাজীর আশঙ্কা ছিল। সেইজন্যই রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগকে অহিংসায় দৃঢ় রাখিবার জন্য তিনি এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা উহাকে সীমাবদ্ধ অর্থে গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং বৈদেশিক প্রভুশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ অহিংস-নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়াই ক্ষান্ত ছিলাম। যে দূরতর দৃষ্টি লইয়া মহত্মাজী উহা প্রবর্তন করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের জনসমাজ যদি অবহিত হইত এবং রাজনীতিতে পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ মহাত্মাজীর নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত তাহা হইলে গৃহযুদ্ধের ভীষণতা হইতে আমরা অব্যাহতি পাইতাম। কিন্তু তাহা হয় নাই, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ আমরা মহাত্মাজীর নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি নাই। ফলে, অতীতে অন্য দেশে যাহা ঘটিয়াছে এবং বর্তমানে আমাদের চক্ষের উপর অন্যান্য দেশে যাহা ঘটিতেছে আমাদের দেশেও ঘটিয়াছে তাহাই। তবে আমাদের দেশের রাজনীতির পূর্বাপর ধারা ও আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাবে ইহা এক বিশেষ প্রকারের রূপ ও গতি লইয়াছে। Civil War বা গৃহযুদ্ধ মুক্তি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া। স্বাধীনতালাভ-প্রয়াসের প্রতিরোধমুখেই গৃহযুদ্ধ দেখা দিয়া থাকে। সুতরাং ইহা রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংঘর্ষরূপেই দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে উহার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের আকারে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রগতি প্রতিহত ও প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য ব্রিটিশ কূটবুদ্ধি সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির প্রবর্তন করিয়াছিল। এই সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির ক্রিয়াই ফুলে ফলে পল্লবিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস, তিক্ততা ও সংঘর্ষ আনিয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত দেশখণ্ডন ও লোক-বিনিময় পর্যন্ত ঘটাইয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াসী ভারতবর্ষে গৃহযুদ্ধ এই পথে ও এই আকারেই দেখা দিয়াছে। মাত্র সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ বলিয়া যাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া আমরা দেখিতে চাহিয়াছি তাহা যে স্বরূপতঃ রাজনৈতিক সংঘর্ষ তাহা ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং গৃহযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করিয়াছে। যে স্থলে মানসিক দুর্বলতাবশতঃ আমরা ভুল করিয়াছিলাম এবং এই সংঘর্ষের স্বরূপ লক্ষ্য করিতে ও স্বরূপে ইহাকে উপলব্ধি করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলাম ইতিহাস সে স্থলে ভুল করে নাই, ইতিহাস পরাঙ্মুখ হয় নাই ; বীজ হইতে বৃক্ষ ও তাহার পরবর্তী পরিণতি প্রকৃতির অপরিহার্য নিয়মেই ঘটিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনা মাত্র সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নহে, প্রত্যুত উহা মুক্তি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন ও ইতিহাসের অঙ্গ।

মুসলীম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামঃ

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও ভারত গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মুসলীম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের’ [মুসলীম লীগের ‘প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের’ প্রস্তাব এখন সর্বত্র কুখ্যাত। ইহা ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত মুসলীম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবদ্বয়ের অন্যতম। ভারতীয় শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে লীগ কাউন্সিল পূর্বে সম্মত হইয়াছিল। উল্লিখিত প্রস্তাবদ্বয়ের প্রথমটির দ্বারা সেই সম্মতি প্রত্যাহার করা হয় এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে মুসলীম লীগের দাবী পূরণের উদ্দেশ্যে চাপ দিবার জন্য প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চালাইবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।] আন্দোলনেই এই

গৃহযুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতি। ১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে কলিকাতায় যাহা ঘটে তাহাকেই এই চূড়ান্ত অবস্থার প্রথম পর্য্যায় বলা যাইতে পারে কিন্তু নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনাতেই ইহার স্বরূপ প্রকাশ। নোয়াখালির পর ঘটনার ধারা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় আরও অগ্রসর হইয়াছে। বিহার, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং সর্বশেষ ও সর্বচূড়ান্ত পাঞ্জাব—এই কয়টি প্রদেশে পর পর সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণের রূপে যাহা ঘটিয়াছে সেগুলিও এই একই ঐতিহাসিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এগুলিও ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালবর্তী Civil War বা গৃহযুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনাক্ষেত্র। ভারতের পূর্ব্বসীমায় নোয়াখালিতে যে অভিযানের প্রারম্ভ দেখা দিয়াছিল পশ্চিম সীমায় পাঞ্জাবে তাহাই বৃহত্তম আকারে ঘটিয়াছে এবং এখনও পাকিস্থানী হানাদারদিগের আক্রমণে কাশ্মীরে সংঘটিত হইতেছে। পাঞ্জাবে ইহার সূত্রপাত হইয়াছে বিভাগের পূর্বে ; এবং বিভাগ হইবার পর পর্যন্ত পাঞ্জাবের পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে মিলিয়া যাহা ঘটিয়াছে তাহা সকল কল্পনাকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। সমগ্র পশ্চিম পাকিস্থান অর্থাৎ পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু হইতে হিন্দুর বাসের প্রায় সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটিয়াছে এবং পূর্ব পাঞ্জাব হইতে মুসলমানের বাস উৎসন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাবের দুই দিকে মিলিয়া মোট এক কোটি লোক উদ্বাস্তু ও স্থানচ্যুত হইয়াছে। ইহা মাত্র সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ফল নহে। একটা বৃহৎ যুদ্ধেও সাধারণতঃ এই বিপুল সংখ্যক লোকের উচ্ছেদ ঘটে না। বিগত যুদ্ধে মধ্য ইউরোপ হইতে যে জনসমষ্টি উৎখাত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা উভয় পাঞ্জাবের মিলিত জনসংখ্যা হইতে অনেক কম। নোয়াখালির ঘটনা দেখিয়াও যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে আমরা ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম পাঞ্জাবের ঘটনা সে ক্ষেত্রে আমাদের কোন সঙ্কোচ বা সংশয়ের অবসর রাখে নাই। আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি যে ঐতিহাসিক স্বরূপে এবং ইতিহাসের বিচারে ইহা গৃহযুদ্ধরূপেই গণ্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় ও প্রতিরোধে গৃহযুদ্ধ বাধাইবার প্রবৃত্তি ব্রিটিশ-অনুগ্রহ-পুষ্ট মুসলীম লীগের দিক হইতেই দেখা দিয়াছিল। ব্রিটিশের প্রসাদে রাজ্যখণ্ডের অধিকারী হইয়া এই গৃহযুদ্ধকে তাহারা অভীপ্সিত শেষ পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থান হিন্দুশূন্য হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্থান হইতে হিন্দুদিগের ব্যাপক বাস্তুত্যাগ আরম্ভ হইয়াছে, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। নোয়াখালির ঘটনা দেখিয়া প্রথমেই বলিয়াছিলাম ইহা সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নহে— "It is a total war on minority"— ইহা মাইনরিটিকে সমূলে উচ্ছেদ করিবারই প্রয়াস। এতদিনে তাহা সম্পূর্ণ সত্যকার রূপে প্রকট হইয়াছে।

বিবরন অসম্পূর্ণঃ

নোয়াখালিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই, প্রকাশ করিবার উপায় ছিল না। সংবাদপত্রের অফিসে অফিসে বহু বিবরণ আসিয়া স্তুপীকৃত হইয়াছে যাহার এক ভগ্নাংশও প্রকাশত হইতে পারে নাই। তৎকালীন গভর্ণমেন্ট বিশেষ নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করিয়া উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া ছলেন। লুণ্ঠন, গৃহদাহ, ধর্মনাশ, হত্যা ও নারীহরণ-নোয়াখালি-ত্রিপুরায় এই পঞ্চাঙ্গ অভিযানের প্রথম দুইটির বিবরণ মোটামুটি বোঝা গিয়াছে এবং দ্বিতীয়টির বিবরণও অনেকটা জানা গিয়াছে, কিন্তু যে দুইটার সম্পূর্ণ বিবরণ জানিবার বিশেষ। প্রয়োজন ছিল, কিন্তু জানা গেল না এবং এখন আর জানিবার উপায় নাই তাহা হইল হত্যা ও নারীহরণ। হত্যার বিবরণ যদিও খানিকটা সংগ্রহ করা যায় নারীহরণের বিবরণ পাইবার সম্ভাবনা আরও কম। কারণ, পরিবারসমূহ বিধ্বস্ত ও বিক্ষিপ্ত, অপহৃতাগণ অপসারিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী। আপনারাই উহা গোপন করিবার জন্য উদ্বিগ্ন। যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে যাহা দেখা গিয়াছে তাহা হইতে খানিকটা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এই দুইটা বিষয় লইয়া যাহারা সংখ্যাগত হিসাব করিতে চাহিবেন তাহারা কখনও বলিতে পারিবেন না যে — "ইহার অধিক হয় নাই; তাহারা বড় জোর বলিতে পারেন যে "এই পর্য্যন্ত হিসাব পাওয়া গিয়াছে বা নির্ধারিত হইয়াছে।"

যে সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রব সম্বন্ধীয় সংবাদ প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হয় তাহাতে প্রথমে বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটিকে [এই কমিটি নিখিল ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পাদক

সম্মেলনের প্রাদেশিক মুখপাত্র এবং কলিকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে লইয়া গঠিত।] একটু বিশেষ সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। বলা হইয়াছিল, প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি যে সকল সংবাদ ও বিবরণের প্রকাশ অনুমোদন করিবেন তাহা নিষেধাজ্ঞার আমলে পড়িবে না। বহু প্রয়াসের পর কমিটি মিঃ সুরাবর্দীর নিকট হইতে এইটুকু অধিকার আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু কমিটির কার্যের ফলে নিষেধাজ্ঞার বিধানসমূহ উল্লিখিত হইতেছে এবং উহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইতেছে এই অভিযোগ করিয়া পরে গভর্ণমেন্ট এই সুযোগ নাকচ করিয়া দেন; তবে যতটুকু কাল ইহা বর্তমান ছিল তাহারই মধ্যে প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির অনুমোদনে নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনা কিছু প্রকাশিত হইতে পারিয়াছিল। প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি না থাকিলে তাহাও প্রকাশ হইত না। এই কমিটির কর্মপরিচালনার সূত্রে এমন বহু সংবাদ ও বিবরণ পাইয়াছিলাম যাহা কমিটির পক্ষেও প্রকাশ করিতে দেওয়া সম্ভব ছিল না ; 'আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও এইরূপ বহু সংবাদ ও বিবরণ গোচরে আসিয়াছিল এবং নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় পরিভ্রমণের সময় প্রত্যক্ষভাবেই সমস্ত শুনিবার ও দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। পড়িয়া, শুনিয়া ও দেখিয়া যাহা জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তাহা হইতেই "নোয়াখালি-ত্রিপুরার ধ্বংসকাণ্ড" রচিত। ইহা ঘটনার আনুপূর্ব্বিক সংগ্রহ বা বিবরণ নহে। পূর্বেই বলিয়াছি ইহা ঘটনার দৃশ্য ও বর্ণনার সহিত জড়িত তৎকালীন চিন্তার প্রতিচ্ছবি। তৎকালীন অবস্থা বুঝিবার পক্ষে ইহার একটা স্বতন্ত্র উপযোগিতা আছে ; সেইজন্য, মধ্যে কিছু সময় বহিয়া গেলেও, প্রবন্ধগুলি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল গ্রন্থের মধ্যে সেই ভাবেই সন্নিবিষ্ট হইল ।**

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
২৬শে বৈশাখ, ১৩৫৫...
৯ই মে, ১৯৪৮, ..
কলিকাতা।

** নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ডের অত্যন্ত-বিলম্বিত প্রকাশের উদ্যোগে এই ভূমিকা লিখিত হইবার পর পুনরায় উহার প্রকাশ স্থগিত হয়। "রাডক্লিফ বাটোয়ারায় কৃত অন্যায়ের ফলে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যে ভাবে নদীয়া জেলায় ছয়শতাধিক বর্গমাইল ভূমি হইতে প্রবঞ্চিত হইয়াছে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং উহার সংশোধনের জন্য আলোচনার তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। সে আলোচনা সম্প্রতি সমাপ্ত হইয়া "Radclife Awarda Case for Revision" আখ্যায় ইংরাজীতে এবং "বাঙলায় র্যা ডক্লিফ বাটোয়ারা সংশোধনের দাবী'-এই আখ্যায় বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী গ্রন্থের ভূমিকায় নোয়াখালির প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এখানেও উল্লেখযোগ্য :-

"It fell to me once to voice the muffled agony of the oppressed people of Noakhali struck down by a dire calamity. It has fallen to me again to advocate the cause of the Nadia people defrauded under the Radcliffe Award. This is destiny. My only satisfaction lies in the hope that my labours will bear the fruits they are intended for."

প্রথম অধ্যায়ঃ

সূচনাঃ

১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস ; ১৬ই আগষ্ট কলিকাতা সহরে মুসলীম লীগ যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিল তাহার জের তখনও পূরা মাত্রায় চলিতেছে ; কলিকাতা মহানগরী বিপর্যস্ত ; লোকের জীবনযাত্রা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ; ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রকোপ কলিকাতা অতিক্রম করিয়া পূর্ববঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ; পূর্ববঙ্গের মফঃস্বল হইতে হিন্দুনিগ্রহের নিত্য নূতন সংবাদ আসিতেছে ; কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ঘটনার জন্য সুরাবর্দী-মন্ত্রিমণ্ডলকে ধিকৃত করিয়া ২৯শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাব উঠিয়াছে এবং তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে মন্ত্রিমণ্ডলকে অপদস্থ করিবার এই চেষ্টার ফল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদিগকে ভোগ করিতে হইবে [অনাস্থা-প্রস্তাবের আলোচনায় লীগ-মন্ত্রী মৌলবী সামসুদ্দীনের বক্তৃতা ; পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত রিপোর্টারদের নিকট জানা যায় লীগদলভুক্ত অপর একজন বিশিষ্ট সদস্য নোয়াখালির নাম করিয়াই সতর্ক করিয়াছিলেন]। বস্তুতঃ বক্তৃতায় ভীতিপ্রদর্শনছলে যাহা বলা হইয়াছিল পূর্ববঙ্গে তখন তাহা কার্যতঃ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ২০শে সেপ্টেম্বর প্রকাশ, পূর্ববঙ্গের উপদ্রব দমনের জন্য থানায় থানায় মিলিটারী বসাইবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে শ্রীআনন্দমোহন পোদ্দার বাঙলার গভর্ণরের নিকট ও ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন এবং কুমিল্লা হইতে শ্রীকামিনী কুমার দত্ত ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভারত গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করিয়া জানাইয়াছেন, অবিলম্বে রক্ষাব্যবস্থা না করিলে গুরুতর অবস্থা দেখা দিবে, কারণ মুসলমান সরকারী কর্মচারীরা প্রকাশ্যেই হিন্দুদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে নোয়াখালির প্রতিনিধি শ্রীহারাণচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের আলোচনায় জেলার অবস্থার প্রতি গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিশেষ সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন এবং জেলার নানা স্থানে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের দীর্ঘ তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতেছেন [অমৃতবাজার পত্রিকা ২৩/৯/৪৬ এবং হিন্দুস্থান ষ্টান্ডার্ড ২৪/৯/৪৬। ইহাই বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ২৮/৯/৪৬ তারিখে।]। ইহা ছাড়া অন্যান্য বিবৃতিতেও অবস্থার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্টের নিকট পুনঃ পুনঃ দাবী করা হইয়াছে। ইহার পরেই আসে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জে হিন্দুদিগের উপর আক্রমণের সংবাদ। তাহার পর ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ জেলার কেরাণীগঞ্জ থানা হইতেও হিন্দুসমাজের উপর অধিকতর ব্যাপক আক্রমণের সংবাদ আসে এবং সর্বত্র প্রবল উদ্বেগের সৃষ্টি করে।

সংবাদ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগঃ

এই অবস্থায়, ২৬শে সেপ্টেম্বর, প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী কলিকাতার সংবাদপত্র সম্পাদকদিগকে সেক্রেটারিয়েটে একটি বিশেষ বৈঠকে আহ্বান করিলেন। সম্পাদক–বৈঠকে মিঃ সুরাবর্দী জানাইলেন যে সাম্প্রদায়িক আক্রমণ ও সংঘর্ষ সম্পর্কিত সংবাদের প্রকাশ নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য তিনি ভারতরক্ষা আইনের বিধান অনুসারে একটা বিশেষ আদেশ জারী করিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার অজুহাত এই যে, কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি–সম্পর্কিত সংবাদ যথেচ্ছ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই দেশের অন্যান্যস্থানে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে ; বিশেষতঃ কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ হিন্দুদিগের দিকে টানিয়াই সংবাদ প্রকাশ করিতেছে। বলা বাহুল্য, কলিকাতার জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহকে লক্ষ্য করিয়াই মিঃ সুরাবর্দী উক্ত মন্তব্য করেন। সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য মিঃ সুরাবর্দী যে আদেশের খসড়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বৈঠকে শুনাইলেন। উহার প্রধান নির্দেশ ছিল এই যে, বাঙলা দেশে

সাম্প্রদায়িক উপদ্রবসংক্রান্ত ঘটনার কোনোরূপ উল্লেখ করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বাদ দিতে হইবে :—

(১) ঘটনার স্থানের উল্লেখ [পরে থানার উল্লেখ অনুমোদিত হইয়াছিল।]

(২) ঘটনায় মৃত অথবা আহত ব্যক্তিদের আঘাত বা মৃত্যুর কারণের উল্লেখ

(৩) আক্রান্ত বা আক্রমণকারী ব্যক্তিদের নাম বা সম্প্রদায়ের উল্লেখ

(৪) দেবস্থান বা পূজার বস্তু অপবিত্র করার বর্ণনা

(৫) ঘটনার এবং ঘটনায় মৃত ও আহত ব্যক্তিগণের ফটো বা অন্য কোনোরূপ চিত্র।

ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয় নিষিদ্ধ হয়, খবরের হেডিংএর হতাহতের সংখ্যার উল্লেখ। এই সমস্ত নিষেধ-বিধান কেবল সংবাদপত্রে প্রাপ্ত সংবাদের উপর প্রযোজ্য হইবে, কিন্তু গভর্ণমেন্ট স্বীয় অভিপ্রায়ানুরূপ যে কোনো সংবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন, তাহাতে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। আদেশের খসড়াটি পড়িয়া মিঃ সুরাবর্দী উহার সম্বন্ধে উপস্থিত সম্পাদকগণের মতামত জানিতে চাহিলেন।

প্রত্যুত্তরে বলিলাম—“আপনার এই আদেশের বিধানসমূহ শুনিয়া। যাহা মনে হইতেছে তাহা খোলাখুলি বলিতে পারি কি ?”

মিঃ সুরাবর্দী—“কেন বলিবেন না?”

বলিলাম—“আমার মনে হইতেছে, পূর্ববঙ্গে যে সকল অত্যাচার কাণ্ড ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটিতে যাইতেছে তাহা চাপা দিবার জন্যই আপনার এই আদেশের ব্যবস্থা।”

এই কথা শুনিয়া মিঃ সুরাবর্দী রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, “আপনি একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে রহিয়াছেন, আর আপনি আমার আদেশের এই কদর্থ করিতেছেন?”

উত্তরে বলিলাম—“মার্জনা করিবেন। আপনার আদেশের অন্য কোনো অর্থ আমার মনে আসিতেছে না; অন্য কোনো অর্থ হয়ও না ; এখানে বাহিরের লোক নাই, অন্ততঃ এই ঘরের মধ্যে পরস্পরের মনের কথা খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করিতে দিন ”

মিঃ সুরাবর্দীর অজুহাত

মিঃ সুরাবর্দী অধিকতর উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া বলিলাম, “আপনি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন, আপনি “বলিয়াছেন, - সংবাদপত্রে সাম্প্রদায়িক অশান্তি-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশের প্রতিক্রিয়াতেই মফস্বলে অশান্তি দেখা দিতেছে। যে সংবাদপত্রগুলি আপনার মন্তব্যের লক্ষ্য সেগুলিতে হিন্দুর উপর মুসলমানের অত্যাচারের সংবাদটাই ফলাও করিয়া ছাপা হয়—ইহা আপনার ধারণা। সুতরাং ইহার প্রতিক্রিয়া যদি কোথাও দেখা দেয় তো পশ্চিমবঙ্গেই দেখা দেওয়া উচিত, পূর্ববঙ্গে দেখা দিতে পারে না। পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিতেছে তাহা যদি কিছুর প্রতিক্রিয়া হয় উহা আপনার দলীয় মুসলিম লীগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুসলমানের উপর হিন্দুর অত্যাচারের কাল্পনিক সংবাদের প্রতিক্রিয়া। সুতরাং দায়ী করিতে হইলে তাহাদিগকেই দায়ী করিতে হয়। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এই সকল ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে যখন কোন প্রতিক্রিয়া নাই তখন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহকে দায়ী করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই।” তথ্য ও যুক্তি দিয়া ইহা খণ্ডন করিবার উপায় ছিল না। মিঃ সুরাবর্দী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন “পশ্চিমবঙ্গেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া আমি সংবাদ পাইয়াছি।”

উত্তরে বলিলাম, “আপনি একটি প্রকাশিত ঘটনার বিবরণ দেখান ; পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের উপর কোন অত্যাচার হইলে আপনার দলীয় সংবাদপত্রসমূহ কখনই তাহা প্রকাশ করিতে ছাড়িত না।”

মিঃ সুরাবর্দী—“প্রকাশিত হয় নাই বটে কিন্তু স্থানীয় লোকেরা আমাকে খবর দিয়া গিয়াছে।”

হোম সেক্রেটারী মিঃ মার্টিন প্রধান মন্ত্রীর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কেমন মিঃ মার্টিন আপনিও কি এইরূপ খবর পান নাই ?", মিঃ মার্টিন বলিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও এইরূপ খবর পাইয়াছি বটে।"

মিঃ মার্টিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম –"মিঃ মার্টিন, আপনার ডিপার্টমেন্ট এইরূপ ঘটনার কোন রিপোর্ট আসিয়াছে কি ?"

তিনি বলিলেন—"না, তবে, লোকে আমাকে বলিয়া গিয়াছে।"

উত্তর বলিলাম—"মিঃ মার্টিন, আপনার হাতে কোন রিপোর্ট নাই, তত্রাচ যদি আপনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হইলে আমি বলি আপনি যে পদ অধিকার করিয়া আছেন তাহার যোগ্যতা আপনার নাই।"

প্রেস এডভাইসরী কমিটি উপেক্ষিতও আদেশ জারীঃ

এইভাবে কিছুক্ষণ তর্কবিতর্কের পর মিঃ সুরাবর্দী ও সিভিলিয়ানবর্গ হয়তো আপনাদের আচরণের অসঙ্গতি উপলব্ধি করিলেন এবং আদেশটা সদ্য সদ্য জারী করিরার উদ্যোগ স্থগিত রাখিতে সম্মত হইলেন। সম্পাদকগণের দিক হইতে প্রস্তাব হইল গভর্ণমেন্ট এইরূপ আদেশ জারী না করিয়া বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির উপর এই শ্রেণীর সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করিয়া নিরস্ত থাকুন। গত মহাযুদ্ধের সময় গভর্ণমেন্ট বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির সাহায্য লইয়াছেন। বর্তমান অবস্থাতেও সেই ব্যবস্থাই পুনরায় প্রবর্তিত হইতে পারে। উভয় পক্ষের এই কথাবার্তার পর আলোচনা চারদিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হইল। স্থির হইল ৩০শে সেপ্টেম্বর, সোমবার পুনরায় সম্পাদকগণের সহিত মিলিত হইয়া মিঃ সুরাবর্দী এবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবেন। ইতিমধ্যে সম্পাদকগণ পরামর্শ করিয়া দেখিবেন প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটিকে দিয়া কি ভাবে সংবাদ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইতে পারে।

এই কথাবার্তা অনুসারে ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার অফিসে বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির আহ্বানে সম্পাদকগণের এক সভা হয় এবং সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের সংবাদ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মিঃ সুরাবর্দীর নিকট প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ সুরাবর্দীর পক্ষ হইতে একটি জরুরী পত্র আসে, ঐ পত্রে জানানো হয় যে, গভর্ণমেন্ট পূর্ব প্রস্তাবমত ৩০শে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন না, সেই দিনই সিদ্ধান্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য সম্পাদকদিগের এক জরুরী বৈঠক আহুত হইয়াছে। গভর্ণমেন্টপক্ষের এই মতিপরিবর্তনে বিস্মিত হইয়া সম্পাদকগণ সেক্রেটারিয়েটের বৈঠকে উপস্থিত হইলেন। মিঃ সুরাবর্দী জানাইলেন, তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিবেন না; আদেশ সদ্যই জারী হইবে; বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির উপর সমস্ত ভার ছাড়িয়া দেওয়ার যে প্রস্তাব হইয়াছিল গভর্নমেন্ট তাহাতে সম্মত নহেন, তবে কমিটিকে সুযোগ দিবার জন্য গভর্ণমেন্ট এইটুকু করিতে রাজী আছেন যে, কমিটির অনুমোদিত সংবাদও গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত সংবাদের ন্যায় প্রকাশিত হইতে পারিবে, নূতন আদেশের মধ্যে এই ব্যবস্থা থাকিবে [ব্যবস্থাটি এইঃ-**"Provided that nothing in this order shall apply to any matter communicated by the Provincial Government to the Press or any communication issued to the Press by the Press Advisory Committee, Bengal."]** ।

এই ব্যবহারে, বিশেষতঃ প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির অনুমোদিত সংবাদকে সরকারী বিবৃতির সমপর্যায়ভুক্ত করায় সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হন। আলোচনাপ্রসঙ্গে মিঃ সুরাবর্দীকে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি সকলের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া সহসা এই আদেশ জারী করিতেছেন। এই আদেশ জারীর কতদিনের মধ্যে আপনি অশান্তি প্রশমিত করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন ?"

মিঃ সুরাবর্দী বলিলেন, "এই আদেশ যদি জারী হইতে পারে তাহা হইলে তিন দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারিব।" এই আদেশই ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতরক্ষা আইনের বিধানানুযায়ী বিশেষ আদেশরূপে জারী হয়।

সংবাদপত্রের প্রতিবাদঃ

মিঃ সুরাবর্দীর এই হঠকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখেই অমৃতবাজার পত্রিকার সিটি অফিসে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকদিগের এক সভা হয়। সভায় স্থির হয় যে, সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশ স্থগিত রাখাই প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সুষ্ঠু উপায়। ১লা অক্টোবর হইতে প্রকাশ স্থগিত রাখিবার জন্য সকল সংবাদপত্রকে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং গত কয়েকদিনের যে সকল ঘটনার ফলে সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন সভার পক্ষ হইতে চারিজনের স্বাক্ষরে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া তাহা সকলকে জানানো হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের সংবাদপত্রে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশ এবং তাহার প্রতিবাদে সংবাদপত্র-প্রতিনিধিদিগের সিদ্ধান্ত ও বিবৃতি। প্রত্যুত্তরে মিঃ সুরাবর্দী ১লা অক্টোবর তারিখের এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানান যে, সংবাদপত্রের কন্ঠরোধ করিবার বা প্রকৃত ঘটনা চাপা দিবার ইচ্ছা তাহার নাই। ১লা অক্টোবর তারিখে পুনরায় সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের এক সভায় মিঃ সুরাবর্দীর এই বিবৃতি বিবেচিত হয় এবং গভর্ণমেন্টকে পুনরায় অনুরোধ করা হয় যে তাহারা আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বিরুদ্ধ-ভাবমুক্ত অবস্থার মধ্যে প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটিকে কাজ করিতে দিন। সভার পক্ষ হইতে চারিজনের স্বাক্ষরে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া সভার এই সিদ্ধান্ত এবং মিঃ সুরাবর্দীর প্রত্যুত্তরে সভার বক্তব্য বিজ্ঞাপিত করা হয়। বলা বাহুল্য, গভর্ণমেন্ট ইহার প্রতি কোনো সুবিবেচনা করেন নাই; ফলে ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতায় জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

ন্যূনপক্ষে ২১ খানি পত্রিকার [আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড, দেশ, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বসুমতী, ভারত ইষ্টার্ণ এক্সপ্রেস, কৃষক, মাতৃভূমি, এ্যাডভ্যান্স, বিশ্বমিত্র, লোকমান্য, জাগৃতি, জয়হিন্দ, প্রত্যহ, ন্যাশনালিষ্ট, উষা, নবযুগ, স্বাধীনতা, দেশদর্পণ।] প্রকাশ স্থগিত থাকে। ইতিমধ্যে ঘটনার গতি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় এবং নূতন ঘটনার উদ্ভব হইতে থাকে। কয়েকদিন এইরূপ চলিলে লোকের মধ্যে দারুণ উৎকন্ঠা দেখা দেয়। তাহার ফলে সংবাদপত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণ পত্রিকা পুনঃপ্রকাশের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হন। ৬ই অক্টোবর পুনরায় তাঁহারা এক সভায় সমবেত হইয়া পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত করেন। স্থির হয়, সরকারী নিয়ন্ত্রণাদেশে প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটিকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা কার্যতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখতে হইবে।

নোয়াখালির উপদ্রবের সংবাদঃ

এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ৮ই অক্টোবর হইতে পত্রিকাসমূহ পুনরায় প্রকাশলাভ করে এবং প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির পক্ষ হইতে সাম্প্রদায়িক উপদ্রবঘটিত সংবাদের সংগ্রহ, সম্পাদন ও প্রচারের ব্যবস্থা হয়। ইহার প্রায় অব্যবহিত পরেই নোয়াখালির ঘটনা ;১০ই অক্টোবর ঘটনা আরম্ভ হয় এবং ১১ই অক্টোবর হইতেই কলিকাতায় লোকমুখে প্রচারিত হইতে থাকে যে, নোয়াখালিতে প্রবল ও ব্যাপক আকারে অরাজকতা দেখা দিয়াছে এবং তথাকার হিন্দুসমাজের উপর ভয়াবহ অত্যাচার সংঘটিত হইয়াছে। তৎকালে সাম্প্রদায়িক উপদ্রবের অন্যান্য সকল সংবাদকে অতিক্রম করিয়া নোয়াখালির ঘটনার সংবাদ যে উৎকন্ঠা ও অনিশ্চিত আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। কিন্তু ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট সংবাদ কিছু পাওয়া যায় নাই। ১৪ই অক্টোবর প্রথম সংবাদ

আসে ; যতদূর মনে হইতেছে প্রথম সংবাদের প্রেরক নোয়াখালি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং পাইকপাড়া জমিদারীর অন্তভুক্ত স্থানীয় ভুলুয়া ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপ্রফুল্ল কুমার ভৌমিক। তাহাদের এই টেলিগ্রাম দিল্লীতে তৎকালীন ভারত, গভর্ণমেন্টের সদস্য শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর নিকটেও প্রেরিত হইয়াছিল। ১৪ই তারিখে প্রাপ্ত সংবাদ প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির অনুমোদন ক্রমে ১৫ই তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। নোয়াখালি-ত্রিপুরার ধ্বংসকাণ্ড সম্বন্ধে কলিকাতায় সংবাদ প্রকাশ এই প্রথম। সংবাদটি এইঃ –

"নোয়াখালি জেলায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে গুণ্ডামীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উত্তেজিত জনতা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিভিন্ন গ্রামে হানা দিতেছে এবং গত ১০ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার হইতে ব্যাপকভাবে খুন, অগ্নিসংযোগ ও লুন্ঠন চলিতেছে। বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, নারীহরণ এবং ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। এপর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, সদর ও ফেণী মহকুমার দুইশতাধিক বর্গমাইল পরিমিত স্থানে হাঙ্গামা চলিতেছে। উপদ্রুত অঞ্চলের প্রবেশপথসমূহে সশস্ত্র গুণ্ডাগণ পাহারা দিতেছে। বহুলোক নিহত অথবা জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছেন— তাহাদের মধ্যে জেলা উকীল-সভার সভাপতি ও তাহার পরিবারবর্গ এবং জেলার একজন বিশিষ্ট জমিদারও আছেন।

কলিকাতার সরকারী মহলে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, উপদ্রুত অঞ্চলে সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ প্রেরণ করা হইয়াছে। সমগ্র রামগঞ্জ থানা এবং লক্ষ্মীপুর থানা, রায়পুর থানা, সেনবাগ থানা, ফেণী থানা, ছাগলনাইয়া থানা, সন্দ্বীপ থানা ও বেগমগঞ্জ থানার কিয়দংশ উপদ্রুত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।"

("আনন্দবাজার পত্রিকা", ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪৬)

১৫ই অক্টোবর এই সংবাদ প্রকাশিত হয়, ঐ তারিখেই কুমিল্লা হইতে শ্রীকামিনীকুমার দত্ত ও শ্রধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একত্রে ভারত গভর্ণমেন্টের ও বাঙলা গভর্ণমেন্টের নিকট এক টেলিগ্রামে অবস্থা বিবৃত করেন ; উহা সংবাদপত্রেও প্রেরিত হয়। টেলিগ্রামটি বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া নিম্নলিখিত আকারে ১৬ই অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় :-

"নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার অধীন গ্রামসমূহে অশান্তির দাবানলে বহু নিরীহলোকের প্রাণহানি ও সম্পত্তিনাশ হইয়াছে। বেগমগঞ্জ এবং লক্ষ্মীপুর থানার কোনো কোনো অঞ্চলেও এই অশান্তির আগুন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামবাসীদের উপর সহস্র সহস্র গুণ্ডা আক্রমণ চালায়। জবরদস্তির ফলে গ্রামবাসীরা তাহাদের গবাদি পশু হত্যা ও অখাদ্য ভক্ষণ করিতে বাধ্য হয়। ব্যাপকভাবে ঘরবাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত গ্রামবাসী জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে এবং শত শত লোক অন্যভাবে প্রাণ হারাইয়াছে। বহু তরুণীকে অপহরণ ও জোর করিয়া বিবাহ করা হইয়াছে। উপদ্রুত গ্রামসমূহে সমস্ত ধর্ম্মস্থানকেই অপবিত্র করা হইয়াছে। অসহায় আশ্রয়প্রার্থীরা ত্রিপুরা জেলায় চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য নোয়াখালির ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ট সময় থাকিতে কোনই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। প্রায় দুইশত বর্গমাইল ব্যাপী এলাকায় উপদ্রব চলিয়াছে ; সেখানে কোনো লোক যাইতে পারিতেছে না বা কোনো লোক বাহির হইয়া আসিতে পারিতেছে না। ঐ এলাকার সমস্ত প্রবেশপথে মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডারা টহল দিয়া ফিরিতেছে।

নিগৃহীত অবস্থায় এখনও যাহারা বাঁচিয়া আছে এবং যে সব নারী অপহৃতা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে উদ্ধার করা একান্ত আবশ্যক। সামরিক সাহায্য ব্যতীত উদ্ধারকার্যে যাওয়া অসম্ভব। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায়ও এই অশান্তির অনল শিখা বিস্তার করায় দক্ষিণ ত্রিপুরার অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর নরহত্যা, গৃহদাহ ও লুন্ঠন সুপরিকল্পিত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার

ফল। গত ১০ই অক্টোবর এই হাঙ্গামা শুরু হয়। অবিলম্বে নোয়াখালি ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় সামরিক প্রহরী মোতায়েন করা একান্ত আবশ্যক। উদ্ধার ও পুনর্বসতির ব্যবস্থা করাও আশু কর্তব্য। নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড কোনো কোনো স্থানে সমগ্র অধিবাসীকে ধর্মান্তরিতকরণ, প্রভূত ধনপ্রাণ নাশ ও নারীহরণের দিক দিয়া বিচার করিলে বলিতে হয়, ইহার কাছে কলিকাতার সাম্প্রতিক দাঙ্গা ম্লান হইয়া গিয়াছে। পরে খবর আসিয়াছে যে, নোয়াখালির অন্যান্য থানায়ও হাঙ্গামা প্রসার লাভ করিয়াছে। ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ এবং লাকসাম থানায়ও অশান্তি সুরু হইয়াছে। যে পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করা হইয়াছে তাহা মোটেই পর্য্যাপ্ত নহে। উন্মত্ত জনতা সমস্ত যোগাযোগব্যবস্থা ছিন্ন করিয়া দিয়াছে এবং রাস্তা ও সেতুগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। এই ব্যাপক ধনপ্রাণহানি যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না হয়, তবে সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ শীঘ্রই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে। উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করা বিশেষভাবে দরকার।”

(“আনন্দবাজার পত্রিকা”, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৪৬)

তৎকালে শ্রীকামিনীকুমার দত্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের অধিনায়ক এবং শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের সহকারী নায়ক। সুতরাং তাহারা একত্রে এই টেলিগ্রামে অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মিঃ সুরাবর্দীর বৈঠকঃ

১৬ই অক্টোবর তারিখে এই টেলিগ্রাম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মিঃ সুরাবর্দী সংবাদপত্র–সম্পাদকগণকে সেক্রেটারিয়েটে এক জরুরী বৈঠকে আহ্বান করেন। বৈঠকে উপস্থিত হইয়াই তাহাকে বলিলাম– “২৬শে সেপ্টেম্বরের সাংবাদিক বৈঠকে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি যে অনুমান করিয়াছিলাম তাহাতে আপনি রুষ্ট হইয়াছিলেন, আমি বলিয়াছিলাম পূর্ববঙ্গে সে সকল নিন্দনীয় ঘটনা ঘটিতেছে ও ঘটিতে যাইতেছে তাহার প্রকাশ বন্ধ করাই এই অর্ডিন্যান্সের আসল উদ্দেশ্য। এখন দেখিতেছেন কি যে আমার অনুমান ও আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হইয়াছে? বস্তুতঃ উহা এত দ্রুত সত্য হইয়া উঠিবে ভাবি নাই।”

মিঃ সুরাবর্দী ইহার কোনও উত্তর না দিয়া জানাইলেন যে, নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রবের সংবাদ ও তৎসংক্রান্ত বিবৃতি সমূহ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। তাহার মতে ২৯শে সেপ্টেম্বরের আদেশের আমলে প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির পক্ষে উহা প্রকাশিত হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই। কামিনীবাবুর ও ধীরেনবাবুর টেলিগ্রামের কথা উঠিতে তিনি বলিলেন উহা প্রকাশেও তাহার আপত্তি আছে ; উহা প্রকাশ করাও প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির পক্ষে উচিত হয় নাই। প্রত্যুত্তরে তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম যে, টেলিগ্রামটি বঙ্গীয় আইন সভার দুই অংশের দুই নেতা কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপ দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত দুইজন নেতার বিবৃতিও যদি প্রকাশ করা না যায়, তাহা হইলে আর কি প্রকাশ করা যাইবে?"

যাহাই হউক, মি: সুরাবর্দী ভিন্নতর উদ্দেশ্যে এই বৈঠক আহ্বান করিলেও, এই সাংবাদিক বৈঠকেই সর্বপ্রথম নোয়াখালি-ত্রিপুরার অবস্থার গুরুত্ব সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইল। প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটি নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনা সম্বন্ধীয় সংবাদ ও বিবৃতি প্রকাশে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেও মিঃ সুরাবর্দী শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, নোয়াখালি ত্রিপুরায় যাহা - ঘটিয়াছে তাহা সত্যই অতীব গুরুতর। মাত্র পুলিশের সাহায্যে উপদ্রবকারীদিগকে দমন করা বা আয়ত্তে আনা সম্ভব নহে, তজ্জন্য মিলিটারীর সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উপদ্রবকারীরা জলপথ অবরুদ্ধ করিয়া, স্থলপথসমূহ কাটিয়া ও অবরুদ্ধ করিয়া, সেতুসমূহ ভাঙ্গিয়া দিয়া এমন অবস্থা ঘটাইয়াছে যে, মিলিটারীর পক্ষেও সহজে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। উপদ্রুত অঞ্চলে হত্যা, লুন্ঠন, ধর্মনাশ প্রভৃতি ঘটিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়া তিনি বলেন–“অরাজকতা ও অত্যাচার দুইই প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে বটে কিন্তু কলিকাতার ঘটনার

তুলনায় উহা কিছু নহে। নোয়াখালির ঘটনার কাছে কলিকাতার হাঙ্গামা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া যায় সংবাদপত্রসমূহ একথা ছাপাইয়া অন্যায় করিয়াছে।"

প্রসঙ্গক্রমে প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনাদের অগোচরে এমনতর একটা গুরুতর কাণ্ড কি করিয়া অকস্মাৎ ঘটিয়া গেল তাহার কোন কারণ বলিতে পারেন কি ?"

প্রধানমন্ত্রী মহাশয় বলিলেন—"কেমন করিয়া ইহা ঘটিল সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নাই।"

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঘটনা ঘটিবার পূর্বে অর্থাৎ ১০ই অক্টোবরের পূর্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে বা মহকুমা হাকিমের নিকট হইতে আপনারা কি কোনই রিপোর্ট পান নাই যে তাহারা উপদ্রবের আশঙ্কা করিতেছেন?"

প্রধানমন্ত্রী মহাশয় উত্তর দিলেন—"না।"

ইতিপূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছিল যে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের পূর্বতন সদস্য মৌলবী গোলাম সারোয়ার এই ধ্বংসকাণ্ডের উদ্যোক্তা ও অধিনায়ক। প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সারোয়ারকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে না কেন?"

তিনি জবাব দিলেন—"সারোয়ার কোথায়? তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সর্বস্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কিন্তু কোথাও ত পাইতেছি না।"

শেষ পর্যন্ত তাহাকে আর একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম-"আপনি কি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, নোয়াখালিতে যাহা ঘটিতেছে উহা মাত্র সাম্প্রদায়িক উপদ্রব নহে—পরন্তু রাজনৈতিক দলবিশেষ (মুসলীম লীগ) কর্তৃক পূর্ববঙ্গ হইতে সংখ্যালঘু হিন্দুসমাজের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস?"

উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলিলেন-"ইহা যদি রাজনৈতিক দলের উপদ্রব হয় তাহা হইলে মাত্র একটা স্থানবিশেষে আবদ্ধ রহিল কেন?" উত্তরে বলিলাম—"তাহারা কার্য্যারম্ভের জন্য সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক স্থানই নির্বাচন করিয়া লইয়াছে।"

প্রধানমন্ত্রী বলিলেন—"মুসলীম লীগের নাম দিয়া যাহারা ইহা করিতেছে তাহারা লীগের হিতৈষী নহে, উহারা লীগের শত্রু।"

এইভাবে তর্কবিতর্কের পর বৈঠক সমাপ্ত হইল। মিঃ সুরাবর্দী যে ঘটনার গুরুত্ব লঘু করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন সাংবাদিকেরা সমবেত ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিলেন। শেষ পর্যন্ত সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া এইটুকু রাজী হইলেন যে তিনি নিজেই শীঘ্র অবস্থা - পরিদর্শনে যাইবেন।

নোয়াখালি যাত্রাঃ

ঠিক এই সময়েই রাষ্ট্রপতি কৃপালনী নোয়াখালি-ত্রিপুরার অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সস্ত্রীক কলিকাতায় আসেন। তিনি এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ১৯শে অক্টোবর তারিখে বিমানযোগে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। মিঃ সুরাবর্দী সাংবাদিক বৈঠকের পরই দার্জিলিং চলিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে তিনিও গভর্ণরসহ এই তারিখেই বিমানে রওনা হন। সরকারী ও বেসরকারীদল ফেণীতে পৌছাইয়া একযোগে অবস্থা পরিদর্শন করিবেন ইহাই কথা ছিল; কিন্তু কার্যতঃ তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শরৎচন্দ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির পক্ষ হইতে এই যাত্রায় আমি সঙ্গী হই এবং ফিরিয়া আসিয়া প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির প্রতিনিধিরূপে আপন অভিজ্ঞতা সংবাদপত্রে বিবৃত করি। নোয়াখালির অভিযান সম্বন্ধে যথাসম্ভব পরিপূর্ণ বিবরণ এই প্রথম। নোয়াখালি পরিদর্শনে যাত্রার এবং নোয়াখালি-ত্রিপুরার অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ইহাই সূত্রপাত।

মিঃ সুরাবর্দী রুষ্ট – পূর্ববঙ্গের ঘটনার প্রকাশ বন্ধ করিতে গভর্ণমেন্ট কৃতসংকল্প — সংবাদপত্রের কন্ঠ অবরুদ্ধ — এই বিদ্যুদগ্নিবজ্রবিস্তারের মধ্যেই ইহার সূচনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

সর্বগ্রাসী অভিযানঃ [আচার্য কৃপালনী ও শরৎচন্দ্রের সহিত পরিদর্শনান্তে ফিরিবার পর প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির পক্ষীয় বিবৃতি। ২৪/১০/৪৬ তারিখে কলিকাতায় প্রকাশিত।]

দমদম বিমানঘাটীতে অনেক প্রতিবন্ধকতার পর আমাদের বিমানখানি অবশেষে সত্যই আকাশে উঠিল; উঠিল বটে, কিন্তু আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা হইল না ; বিমান ফেণীর দিকে না গিয়া কুমিল্লার দিকে চলিল। আমরা জানিতাম গবর্ণর (প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীসহ) ফেণীতে যাইতেছেন, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তথায় গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া। কিন্তু বিমানঘাটীর কর্তৃপক্ষ বলিলেন গবর্ণর ফেণী যান নাই, গিয়াছেন কুমিল্লায়; কারণ ফেণীর বিমানঘাটী বহুদিন অব্যবহৃত ও বেমেরামত থাকায় বিমান-অবতরণের পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়া আছে। ইহার পর কুমিল্লা পৌঁছিয়া যখন শুনিলাম গবর্ণর কুমিল্লায় আসেন নাই ফেণীতেই গিয়াছেন এবং তথাকার কাজ সারিয়া ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম রওনা হইয়া গিয়াছেন তখন আমাদের মনের অবস্থা কি হইল সহজেই অনুমেয়। কুমিল্লা ঘাটী হইতেই সরাসরি চট্টগ্রাম চলিয়া যাইবার জন্য প্রথম ঝোঁকে সকলেরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু পরে তাহা স্থগিত করিয়া চট্টগ্রামে টেলিফোনযোগে আলাপ করা হইল, স্থির হইল পরদিন প্রাতে তথায় পৌঁছিয়া গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করা হইবে; সে রাত্রি আমরা কুমিল্লাতেই কাটাইলাম।

“What man has made of man" :

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া সরকারী ও বেসরকারী পক্ষ একযোগে অবস্থা পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করিবেন বলিয়া আমাদের যে কল্পনা ছিল তাহা এইভাবে ব্যর্থ হইল। কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইলেও কুমিল্লায় যাইবার পথে, কুমিল্লা শহরে এবং পুনরায় চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে নোয়াখলির ধ্বংসকাণ্ডের আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম। আমাদের বিমানখানি যথাসম্ভব নীচু দিয়াই উড়িয়া যাইতেছিল এবং ধ্বংসকাণ্ডের দৃশ্যসমূহ পুনঃপুনঃ আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। তখন বর্ষা সদ্যঃ শেষ হইয়াছে। নবজাত শষ্পশস্যে পল্লীপ্রান্তর শ্যামশ্রী–মণ্ডিত। সেই কোমল শ্যামলার আবেষ্টনীর মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহদাহ এবং তদুপরি উত্থিত ধূমকুণ্ডলী চক্ষুর পক্ষে নিদারুণ পীড়াজনক হইয়া দাঁড়ায়। এই দৃশ্যাবলীর উপর দিয়া যাইতে যাইতে ইংরাজ কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের সুপ্রসিদ্ধ কবিতার ছত্রটি কেবলি মনে আসিতে লাগিল —

"What man has made of man"
“মানুষ মানুষের কী শত্রুতাই না করিয়াছে”।

বিমানে যাইতে যাইতে একস্থলে দেখিলাম উপদ্রুত জনতা এক জ্বলন্ত গ্রাম ছাড়িয়া ছুটিয়া যাইতেছে। দৃশ্যটি এমন মর্মস্পর্শী যে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল সেখানেই বিমান নামাইয়া অসহায় নরনারীকে যথাসাধ্য সাহায্য করা। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। অনেক গ্রাম দেখিলাম দগ্ধ হয় নাই বটে কিন্তু সেগুলিতে জীবনের কোন চিহ্ন মাত্র নাই, দেখিলাম জনতা জলস্রোতের ধারে এবং নৌকায় পার

হইবার স্থানে আসিয়া ভীড় করিতেছে। একজায়গায় আমরা প্রত্যক্ষই দেখিলাম একদল লোকে মিলিয়া একটি সাঁকো ধ্বংস করিতেছে। বুঝিলাম ধ্বংসকাণ্ড তখনও চলিতেছে।

আকাশ হইতে যাহা দেখিতে পাই নাই কুমিল্লায় আসিয়া পলায়িত নরনারীকে দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিলাম। কুমিল্লা সহরে তখন দলে দলে আশ্রয়প্রার্থী অবিরাম-গতিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম তখনও তাহারা আসিতেছে। তাহাদের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, মুখমণ্ডল বিশুষ্ক ও বিবর্ণ এবং কন্ঠস্বর প্রায় অবরুদ্ধ; দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম কী ভয়াবহ দুর্গতির মধ্য হইতে ইহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে ; চতুর্দিকে অকস্মাৎ এক সর্বব্যাপী বিভীষিকার রাজত্বের প্রাদুর্ভাব ; আক্রমণোদ্যত সেনাদলের অভিযান যে সকল ত্রাসের কারণ ঘটায় এখানকার অবস্থা তাহা অপেক্ষাও আতঙ্কজনক; কারণ সৈন্যদলের অভিযান সাধারণতঃ দলবদ্ধ নারীহরণ, দলবদ্ধ ধর্মান্তর বা ব্যাপক দেবায়তন ধ্বংস ঘটায় না। এই অগণিত উপদ্রুত নরনারী যাহারা আজ আশ্রয়প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ছিল, এক রাত্রের মধ্যে অবস্থা-বিপর্যয়ে ইহারা কপর্দকহীন ভিক্ষুকে পরিণত হইয়াছে। ইহাদের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা সমাজের পক্ষে এক দারুণ উদ্বেগজনক সমস্যা ; রাষ্ট্রের পক্ষেও এই সমস্যায় উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাঙলায় বর্তমানে যে রাষ্ট্রশাসন চলিতেছে তাহা জনগণের দুঃখদুর্দশায় চিন্তিত নহে। এই শাসনের যাহারা কর্ণধার তাহারা নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রবঘটিত অবস্থার গুরুত্ব লঘু করিবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

উপদ্রব নহে অভিযানঃ

এই সকল ঘটনাকে মাত্র ‘উচ্ছৃঙ্খলতা’ বা ‘সাম্প্রদায়িক উপদ্রব’ আখ্যা দিলে উহাদের পরিচয় বিকৃত করা হইবে। উহা স্থানীয় সংখ্যালঘু সমাজের বিরুদ্ধে সর্বগ্রাসী সংগ্রাম। বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিসভা যে রাজনৈতিক দলের দখলে তাহারই [মুসলীম লীগ] নামে এবং সরকারীমহলের গোপন যোগাযোগে এই সংগ্রাম পরিচালিত হইয়াছে। সরকারীমহল গোপনে গোপনে ইহাকে সমর্থন করিয়াছেন অথবা প্রতিকারে উদাসীন থাকিয়া প্রশ্রয় দিয়াছেন। উপদ্রুত অঞ্চলে সংখ্যালঘু সমাজের পক্ষে তিনটি পথ খোলা রহিয়াছে—হয় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে, নয় মৃত্যুবরণ করিতে হইবে অথবা সম্ভব হইলে পলায়ন করিয়া অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইবে। ১০ই অক্টোবর আক্রমণের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উপদ্রুত অঞ্চল বাহিরের লোকের পক্ষে অনধিগম্য হইয়া রহিয়াছে—উদ্ধার করিবার অথবা স্থানে গিয়া দুর্গতিলাঘবের—কোন সুযোগই কাহাকেও দেওয়া হইতেছে না। সংখ্যালঘু সমাজের সামাজিক জীবন একেবারে উৎসন্ন—তাহারা সম্পূর্ণ ধ্বংসের সম্মুখীন।

গভর্ণমেন্টের চূড়ান্ত ব্যর্থতা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে বর্বর উপদ্রবকারীদলকে এতদিনে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল যে গবর্ণমেন্টের অস্তিত্ব এখনও আছে। গবর্ণমেন্টের ও তাহাদের কর্মচারিগণের যদি কর্তব্যপালনে কিছুমাত্র আন্তরিক আগ্রহ থাকিত তাহা হইলে ইহাই তাহাদের পক্ষে সর্বপ্রধান করণীয় ছিল। ১০ই অক্টোবর নোয়াখালির পূর্বতন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এন, জি, রায়কে সিউড়ীতে বদলী করা হয় এবং নূতন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্নি কার্যভার না লওয়া পর্যন্ত জেলার ভার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জামানের হাতে থাকে। ১০ই হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত এই অবস্থা চলে এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য থাকে [পরে জানা যায় ১৬ই অক্টোবর পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল। ১৬ই অক্টোবর নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট বিমানযোগে গিয়া কার্যভার গ্রহণ করেন।]। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই কয়দিনের মধ্যেই সংখ্যালঘু সমাজের উপর পূর্ব্বসংকল্পিত ও পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ অকস্মাৎ আরম্ভ হইয়া উগ্রতম আকার ধারণ করে। এই কয়দিন, জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ ভার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জামান এবং পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেট মিঃ আবদুল্লার উপর ন্যস্ত ছিল।

আক্রমণ-প্রণালী ও উপদ্রুত অঞ্চলঃ

এই আক্রমণে গুণ্ডা-প্রকৃতির লোকের যোগ দেওয়ার কথাটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া প্রচারিত হইয়াছে। গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক ইহার মধ্যে যে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে বিপুল ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইয়াছে তাহা মাত্র গুণ্ডাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। গুণ্ডারাই অগ্রগামী হইয়া কাজ করিয়াছে বটে কিন্তু যে সকল স্থান আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেই সকল স্থানে তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত অধিবাসীরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছে। ইহাদের কর্মপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায় আক্রমণ সঙ্গবদ্ধভাবেই ঘটিয়াছিল এবং কোনো কেন্দ্রীয় নির্দেশের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। আক্রমণের প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় সার্ট ও হাফপ্যান্ট পরিহিত দলবদ্ধ যুবকগণ স্থলপথে অগ্রসর হইয়াছে। একহাতে বলয় ইহাদের বিশেষ চিহ্ন। ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে জলপথে অগ্রসর হইয়াছে বড় এবং ছোট নৌকা। এগুলিতে খাদ্যবস্তু এবং আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি বাহিত হইয়াছে। নির্দিষ্টস্থানসমূহে স্থলপথগামী দল থামিয়াছে এবং নৌকায় বাহিত লোকজন ও দ্রব্যসম্ভারের সাহায্য লইয়া তাহাদের কার্য্য সমাধা করিয়াছে। এক এক দলের মধ্যে আবার কার্য্যের বিভাগ আছে, কাহারও গৃহদাহ, কাহারও নারীহরণ, কাহারও লুন্ঠন ও কাহারও হত্যা। দলের প্রত্যেক অংশ হুইসিলের সঙ্কেত-ধ্বনি অনুসারে কার্য্য আরম্ভ ও সমাধা করিয়াছে। কার্যশেষের পর মৃতদেহগুলি নৌকায় করিয়া সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ। গৃহদাহ-কার্য্য সহজে সমাধা করিবার জন্য তাহারা প্রভূত পরিমাণে পেট্রোল ব্যবহার করিয়াছে এবং ষ্টীরাপ পাম্পের দ্বারা উহা ছিটাইয়া দিয়াছে। এই বিষয়টাই বড় আশ্চর্য ঠেকিয়াছে—ইহারা এত পেট্রোল কোথা হইতে পাইল?

পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ধরিয়া নোয়াখালি জেলার প্রায় অর্ধাংশ উপদ্রুত। পূর্বে ফেণী হইতে চৌমূহানি হইয়া যে রাজপথ পশ্চিমে লক্ষ্মীপুরের দিকে গিয়াছে সেই পথের উত্তরে এই উপদ্রুত অঞ্চল অবস্থিত। থানা ধরিয়া হিসাব করিলে ফেণী, ছাগলনাইয়া, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, রায়পুর এবং রামগঞ্জ থানা উপদ্রুত অঞ্চল বলা যাইতে পারে, পরশুরাম থানার অবস্থা খুব নিশ্চিত নহে। এই সকল স্থানের সন্নিহিত ত্রিপুরার কয়েকটি থানাতেও উপদ্রব ছড়াইয়া পড়িয়াছে । ফরিদগঞ্জ, হাজিগঞ্জ, লাক্সাম এবং চৌদ্দগ্রাম থানা বর্তমানে উপদ্রুত এবং লাক্সাম ও কুমিল্লার মধ্যবর্তী কোন স্থান পর্যন্ত আপাততঃ ইহা প্রসারিত। দ্রুতভাবে এবং দৃঢ়ভাবে যদি অবিলম্বে ইহাকে প্রতিহত করা না হয় তাহা হইলে নোয়াখালির ন্যায় ত্রিপুরা জেলায়ও উপদ্রবকারীদের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহাদিগকে প্রতিহত করার জন্য গভর্ণমেন্টের কোন উদ্যোগ বা অভিপ্রায়ের চিহ্নমাত্র এখনও দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তরে জানা যাইতেছে যে লুন্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি অপরাধে হাতে হাতে যাহারা ধরা পড়িতেছে তাহাদিগকেও নামমাত্র জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে।

উদ্ধার ও সাহায্যের সমস্যাঃ

আমাদের সম্মুখে বর্তমানে যে সমস্যা সর্ব্বপ্রধান তাহা হইল অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণের উদ্ধার সাধন। উপদ্রুত অঞ্চল যাহাতে বাহিরের লোকের পক্ষে সহজগম্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মিলিটারীর সহায়তা ছাড়া ইহা সম্ভব নহে, সুতরাং উপদ্রবকারী জনতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের স্বাধীন ক্ষমতা মিলিটারীকে দিতে হইবে। অবরুদ্ধ ব্যক্তিগণকে যদি অবিলম্বে উদ্ধার করা না হয় তাহা হইলে, তাহাদের আর কোন দুর্গতি না হইলেও, তাহারা খাদ্যাভাবেই মারা যাইবে। আর একটি প্রধান সমস্যা উদ্বাস্তু নরনারীকে আহার জোগানোর সমস্যা। একমাত্র ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী সমবেত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাই চল্লিশ হাজারের কম হইবে না। ইহাদিগের খাদ্য সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন—সরকারীভাবেই হউক আর

বেসরকারীভাবেই হউক। পুনর্বসতির ব্যবস্থার কথা উঠাইবার সময় এখনও হয় নাই। এই উৎসন্ন জন-সমাজকে পুনরায় তাহাদের পূর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা কখনও সম্ভব হইবে কিনা এবং সম্ভব হইলে কি প্রণালীতে তাহা করিতে হইবে তাহা গভীরভাবে এবং সতর্কভাবে চিন্তা করিয়া স্থির করিতে হইবে।

রাত্রিতে ঘুম আসিল না। সমগ্র বিনিদ্র রজনী ধরিয়া এই সকল চিন্তাই আমার মনকে অত্যন্ত পীড়িত ও ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিল। রবিবার প্রত্যুষে আমরা বিমানে কুমিল্লা ত্যাগ করি এবং দেড় ঘন্টার মধ্যেই চট্টগ্রামে উপস্থিত হই।

সুরাবর্দীর রোষ ও শ্লেষঃ

চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়া আচার্য কৃপালনী ও শরৎচন্দ্র গবর্ণরের সহিত আলোচনায় নিযুক্ত হন। সেই অবসরে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ মিঃ সুরাবর্দীর সহিত কিছু আলাপ করিয়া লন। মিঃ সুরাবর্দী তখন ক্রোধে অগ্নিশর্মা। সমস্ত সংবাদপত্র মিলিয়া, এমন কি ষ্টেটসম্যান পর্যন্তও, নোয়াখালির হতাহতের সংখ্যা অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়াইয়া বলিয়াছে— ইহাই তাহার অভিযোগ। জেলার সরকারী কর্মচারীদিগের নিকট হইতে তিনি যে সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা একশতের উর্দ্ধে যাইবে না। তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম যে এই সকল কর্মচারীই স্বীয় দুষ্কৃতি ও কর্তব্যে অবহেলার দ্বারা ধ্বংসকাণ্ডের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, সুতরাং তাহাদের হিসাব কখনই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। পক্ষান্তরে সংবাদপত্রের বিবরণ ভুক্তভোগীদের নিকট হইতে সংগৃহীত হওয়ায় তাহাই নির্ভরযোগ্য। মিঃ সুরাবর্দী ইহাতে কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি নাকি আসিবার পথে কয়েকখানি ভগ্ন গৃহ ব্যতীত উপদ্রবের আর কোন চিহ্ন দেখিতে পান নাই। ইহা তাহার বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা হইতেই আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম গবর্নর কি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর (ফিরিবার সময় আমরা তাহাকে আমাদের বিমানেই আনিয়াছিলাম) এই আত্মপ্রসাদ সত্ত্বেও চট্টগ্রাম হইতে ফিরিবার পথে নোয়াখালি সহর অতিক্রম করিবার কিছুক্ষণ পর হইতেই উভয় পার্শ্বে ধূম ও অগ্নি দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল; গ্রামের পর গ্রাম বিধ্বস্ত, অধিবাসীদের কি হইয়াছে ভগবানই জানেন; কতগুলি গ্রাম পুড়িয়া অঙ্গারে পরিণত হইয়াছে, কতকগুলির উপর দিয়া আম্রকুঞ্জ ভেদ করিয়া কুণ্ডলায়িত ধূমরাশি উপরে উঠিতেছে, কতকগুলি সদ্য সদ্য পুড়িতেছে এবং লেলিহান অগ্নিশিখা আকাশে উঠিতেছে। এই দৃশ্যের প্রতি প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে তিনি শ্লেষ করিয়া উত্তর দিলেন—অকারণ আতঙ্কগ্রস্ত অধিবাসীরা পলায়ন করিয়াই এই অবস্থা ডাকিয়া আনিয়াছে ; সত্য সত্যই এই সকল হতভাগ্য গ্রামবাসীকে পলায়নের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে অথবা তাহাদের গৃহদাহের বহ্নিতেই তাহাদের মৃতদেহ আহুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা চিন্তার বিষয়। কিন্তু যদি আমরা মিঃ সুরাবর্দীর অনুমানই সঠিক বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলেও বর্তমান বাঙলা গভর্ণমেন্টকে একটি প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে। তাহারা কি এমন কোন অলিখিত আইন জারী করিয়াছেন যে, কোন গ্রামের একশ্রেণীর অধিবাসীরা যদি বাড়ী খালি রাখিয়া যায় তাহা হইলে তাহাদের অপর সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিবেশিগণ তাহাতে আগুন লাগাইয়া দিবার অধিকারী হইবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে- পথের দুই পার্শ্বে সামান্য অংশই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। ইহার বাহিরে কি ঘটিয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হইতে বাকী।

রাজার শাসন!

এইরূপ মধ্যযুগীয় বর্বরতার পরিচয় যে কখনও প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই; গভীর বেদনার বিষয় যে ইহা দেখিতে হইল এবং গভীরতর দুঃখের কথা এই যে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে পারিয়াছে। গভর্ণর ইংরাজ, চীফ সেক্রেটারী ইংরাজ, বিভাগীয় কমিশনার ইংরাজ এবং পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল ইংরাজ—ইহাদের অধীনেই নোয়াখালিতে এই ধ্বংসকাংশু ঘটিল ; ইহারাই আবার জগতের সমক্ষে গর্ব করিয়া থাকেন যে ইহারা ভারতবর্ষে "রাজার শাসন" চালাইতেছেন!

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

ঘটনার পরঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনা ও অবস্থা সম্বন্ধে এই সময়ে আরও অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য বিবৃতি এবং অত্যাচারের কিছু কিছু সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশিত হয়। এ সমস্তই প্রকাশিত হইতেছিল প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটীর অনুমোদনে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু-সমাজের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারকাহিনী লোকচক্ষু হইতে অন্তরাল করিয়া রাখিবার জন্য নিষেধাজ্ঞার যে লৌহ-যবনিকা রচিত হইয়াছিল এই সকল বিবৃতি, সংবাদ ও বিবরণ প্রকাশের ফলে তাহাতে ফাটল দেখা দিল। ইহাতে সুরাবদী-গবর্ণমেন্ট রুষ্ট হইলেন এবং বিচলিত হইলেনও বটে। যে গোপন অভিপ্রায় লইয়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল কমিটীর কার্যের ফলে তাহা ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া তাহারা কমিটীর কন্ঠরোধ করিতে অগ্রসর হইলেন। ২৯শে সেপ্টেম্বরের আদেশে কমিটীর নিজ দায়িত্বে সংবাদ প্রকাশের যে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল ৩১শে অক্টোবর এক নুতন আদেশে তাহা রহিত করা হইল। ফলে সংবাদপত্রের পক্ষে সরকারী বিবৃতি ছাড়া সাম্প্রদায়িক উপদ্রব সম্বন্ধে অন্য কোনো বিবরণ নিরুদ্বেগে প্রকাশ করিবার উপায় রহিল না। গবর্ণমেন্টের এই আচরণের কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়া ২'রা নভেম্বর কমিটী এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাহাতে বলেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহের কন্ঠরোধ করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলের অনুগৃহীত মুসলীম লীগের পত্রিকা কয়টীকে যথেচ্ছভাবে অভিসন্ধিপূর্ণ ও বিকৃত সংবাদ প্রকাশের সুযোগ দিবার জন্যই এই অপকৌশল অবলম্বিত হইয়াছে।

বিবৃতি ও বিবরণঃ

কিন্তু প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটীর ক্ষমতা এইভাবে রহিত করা হইলেও ৩১শে অক্টোবরের মধ্যেই কমিটীর অনুমোদনে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা হইতেই নোয়াখালি-ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত ধ্বংসকাণ্ডের পরিচয় লোকে বুঝিয়া লইতে পারিয়াছিল। অবশ্য ইহার পরেও বিবৃতি ও বিবরণ কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তৎকালীন নিষেধাজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য সেগুলি হইতে প্রায়ই বিশেষ অংশ বাদ পড়িয়াছে। এমন কি মিস মুরিয়েল লিষ্টারের ন্যায় বিশিষ্ট মহিলার বিবৃতিও অব্যাহতি পায় নাই। অথচ এই বিবৃতিগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট। কারণ মূল ঘটনা ও উহার পরবর্তী ফলাফলের সমস্ত সংবাদ প্রকাশ না পাইলেও এই সকল বিবৃতি অনুধাবন করিয়াই আমরা ঘটনার প্রকৃতি ও গতি বুঝিতে পারি। ১০ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবরের মধ্যে ঘটনার মূল অংশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু উহার জের চলিয়াছিল বহুদিন ধরিয়া। প্রথমবার পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার কিছুকাল পরে দ্বিতীয়বার পরিদর্শনের জন্য যখন যাই তখনও উপদ্রবমূলক ঘটনার জের চলিতেছিল এবং বিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও ঘটনার সংখ্যা কম ছিল না। উপদ্রুত অঞ্চলে স্বয়ং গান্ধীজীর উপস্থিতিও তাহা বন্ধ করিতে পারে নাই। আমরা দ্বিতীয়বার পরিদর্শনে যাত্রা করিবার পূর্ব পর্যন্ত ঘটনার পরিণতি কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং আমাদের পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা কি পটভূমিকা হইতে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বুঝাইবার জন্য মধ্যবর্তী কালের এই বিবৃতিসমূহের আলোচনা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্য দিয়াই তৎকালীন অনভিব্যক্ত ইতিহাস কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হইয়াছে।

বেরসকারীমহলের এই বিবৃতিসমূহের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আচার্য্য কৃপালনীর বিবৃতিই প্রধান। রাষ্ট্রপতির পদোচিত দায়িত্ব লইয়া তিনি গভীর বেদনাপূর্ণ এবং তথ্যানুসারী যে কয়টি বিবৃতি প্রদান করেন তাহাই নোয়াখালি-ত্রিপুরার অত্যাচার-পর্বকে বিশ্বসমাজের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরে। অবশ্য দিল্লী হইতে প্রচারিত মহাত্মাজীর বেদনার্ত্ত ভাষণের স্থান সকলের উচ্চে। তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়। আপাততঃ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির উল্লেখ করিতেছি—

(১) আচার্য কৃপালনীর প্রথম বিবৃতি, ২১শে অক্টোবর

(২) আচার্য কৃপালনীর দ্বিতীয় বিবৃতি, ২২শে অক্টোবর

(৩) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য শরৎচন্দ্রের। আবেদন, '২২শে অক্টোবর

(৪) গভর্ণরের রিপোর্টের প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্রের বিবৃতি, ২৩শে অক্টোবর

(৫) কুমিল্লা হইতে শ্রীকামিনীকুমার দত্ত কর্তৃক ভারত গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট প্রেরিত দীর্ঘ বিবরণ, ২৩শে অক্টোবর

(৬) আচার্য কৃপালনীর তৃতীয় বিবৃতি ও তাহার ভ্রমণপঞ্জী, ২৭শে অক্টোবর

(৭) মুসলীম লীগ পক্ষীয় শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের অভিমত, ২৯শে অক্টোবর

(৮) দিল্লীর সাংবাদিক বৈঠকে আচার্য কৃপালনীর বিবৃতি, ৩০শে অক্টোবর

(৯) গভর্ণরের নিকট শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের খোল চিঠি, ৩১শে অক্টোবর

(১০) মুসলীম লীগের প্রত্যুত্তরে আচার্য কৃপালনীর বিবৃতি, ৩রা নভেম্বর

(১১) দমদম বিমানঘাঁটিতে পণ্ডিত জওহরলালের মন্তব্য, ৩রা নভেম্বর

(১২) মিস মুরিয়েল লিষ্টারের বিবৃতি, ৮ই নভেম্বর

(১৩) শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর বিবৃতি ও পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর বিবৃতি, ১০ই নভেম্বর

(১৪) শ্রীমতী রেণুকা রায়ের বিবৃতি, ১৩ই নভেম্বর

(১৫) কেন্দ্রীয় আইন সভায় পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতি, ১৫ই নভেম্বর

(১৬) বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র দাসের বিবৃতি, ১৬ই নভেম্বর

(১৭) শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর দুইটি বিবৃতি, ১৭ই ও ১৮ই নভেম্বর [বিবৃতিগুলির সহিত প্রদত্ত তারিখ "হিন্দুস্থান ষ্ট্যান্ডার্ড" পত্রিকার (কলিকাতা সংস্করণ) কয়েকটি বিবৃতি পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল।]

আচার্য কৃপালনীর বিবৃতিঃ

আচার্য কৃপালনীর প্রথম বিবৃতি প্রথমবার উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পরই প্রদত্ত। উপদ্রুত অঞ্চলের তৎকালীন অবস্থা ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন-উৎপীড়িতের সংখ্যা সহস্র সহস্র, সরকারী হিসাবে ইহা নিতান্ত কম করিয়া দেখানো হইতেছে। আক্রমণ সামরিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হইয়াছে এবং প্রাক্তন সৈনিকেরাই উহাতে নেতৃত্ব করিয়াছে। দ্বিতীয় বিবৃতিতে তিনি পরলোকগত রাজেন্দ্রলাল রায়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া যে কোন উপায়ে আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রীপুরুষ সকলকে অনুরোধ করেন। প্রথম বিবৃতিতে আচার্য কৃপালনী যাহা বলিয়াছিলেন, উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ আরও পরিদর্শনের পর তৃতীয় বিবৃতিতে অধিকতর দৃঢ়তার সহিত এবং অধিকতর সবিশেষে তিনি তাহার পুনরুক্তি করেন। আক্রমণ যে মুসলীম লীগের দ্বারা পরিচালিত ও পূর্ব্বকল্পিত, কর্তৃপক্ষ যে পূর্ব্ব হইতে উহার উদ্যোগ জানিয়াও উহার প্রতিকার না করিয়া প্রশ্রয়ই দিয়াছেন এবং স্থানীয় মুসলমানেরাই যে দল বাঁধিয়া এই উপদ্রব চালাইয়াছে ইহার

অখণ্ডনীয় প্রমাণ তিনি পাইয়াছেন। উপদ্রবের প্রথমে প্রত্যেক হিন্দুপরিবারের নিকট হইতে মুসলিম লীগের জন্য চাঁদা (পরিবারবিশেষে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত) আদায় করিয়া পরে পরিবার-সমূহকে উৎসন্ন করা হইয়াছে। নিহতের সংখ্যা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে একমাত্র দত্তপাড়া অঞ্চলেই তিনশত নিহতের হিসাব তিনি পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের নামও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নারীহরণ ও নারীধর্ষণের সংখ্যা কত তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। হাইমচরের বিরাট নমঃশূদ্র বসতি বিধ্বস্ত হইয়াছে। তখনও উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশের পথ নাই, উৎপীড়িতগণ অসহায়ভাবে অবরুদ্ধ এবং পুলিশ ও সরকারী কর্মচারিগণ নিষ্ক্রিয়। এই বিবৃতিতে যে সকল অভিযোগ তিনি করিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাহার অভিমত এতখানি দৃঢ় যে, যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক মণ্ডলীর নিকট তিনি তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য ভার লইতে প্রস্তুত।

এই ধ্বংসকাণ্ডের ব্যাপারে স্ব স্ব দায়িত্ব লঘু করিবার উদ্দেশ্যে মুসলীম লীগ ও বাঙলার লীগ গভর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে প্রচারকার্য সুরু করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগ ২৫শে অক্টোবর তারিখে এ সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া আপনাদের ও মুসলমান সমাজের দায়িত্ব অস্বীকার ও লঘু করিতে চেষ্টা করেন এবং আচার্য কৃপালনীর পূর্ব বিবৃতির নিন্দা করেন। নোয়াখালির অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত জেনারেল বুসার ২৬শে অক্টোবর তারিখে কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাহার মধ্যেও অবস্থার গুরুত্ব লঘু করিবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। আচার্য কৃপালনীর ২৯শে অক্টোবর ও ৩১শে অক্টোবরের বিবৃতি এই সকল অপ্রচারের প্রত্যুত্তর। দুইটি বিবৃতিই দিল্লীতে সাংবাদিক বৈঠকে প্রদত্ত।

ইহাদের এই সকল উক্তির প্রত্যুত্তরে আচার্য কৃপালনী বলেন যে যথেষ্ট ভাবিয়া এবং স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াই তিনি বিবৃতি দিয়াছেন। উৎপীড়িত সমাজের উপর অনুষ্ঠিত অনেক জঘন্য নিগ্রহের কথা জানিয়াও তিনি প্রকাশ করেন নাই। কারণ তাহাতে তিক্ততা বৃদ্ধি পাইবে। তবে এইটুকু তিনি বলিবেন যে, যাহারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হইয়াছিল, যে সকল নারী বলপূর্বক বিবাহিত হইয়াছিল তাহাদের মৃত্যু হইলেই তিনি খুসী হইতেন। বাঙলা গভর্ণমেন্টের এবং জেনারেল বুসারের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া তিনি বলেন—ঘটনাস্থলে যে সামরিক বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে তাহাদিগকে স্থানীয় শাসন কর্মচারীদের নির্দেশে চলিতে হয়। এইজন্য দুর্বৃত্তগণ গ্রেপ্তার হইতেছে। ২৭শে অক্টোবর তারিখে নোয়াখালির নূতন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্ণি এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলেন—"Rape, abduction and forcible marriages are rare and no such cases were brought to my notice." অর্থাৎ "ধর্ষণ, নারীহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ ঘটে নাই বলিলেই হয়, অন্ততঃ, এরূপ কোন ঘটনা আমার গোচরে আসে নাই।"

ইহার প্রত্যুত্তরে আচার্য কৃপালনী বলেন —২৫শে অক্টোবর তারিখে এই ম্যাজিষ্ট্রেটকেই সঙ্গে লইয়া শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী একটি বলপূর্বক বিবাহিতা বালিকাকে এবং তাহার বলপূর্বক ধর্মান্তরিত আত্মীয়স্বজনকে উদ্ধার করেন। তৎসত্ত্বেও যে তিনি এইরূপ অমূলক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় সরকারী কর্মচারীরা কি মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিতেছিলেন।

আচার্য কৃপালনীর শেষোক্ত বিবৃতিতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চট্টগ্রামের সদস্য শ্রীললিতচন্দ্র দাসের এক পত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ২৯শে অক্টোবর "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহাতে ললিতবাবু জানাইয়াছিলেন যে, ২২শে অক্টোবর তারিখে কুমিল্লায় সার্কিট হাউসে এক সরকারী বৈঠকে বহু লোকের উপস্থিতিতে উক্ত ম্যাজিষ্টেট সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেন যে ব্যাপক ধর্ম্মনাশ, নারীহরণ এবং বলপূর্বক বিবাহ করা হইয়াছে। ইহা পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ এবং প্রাক্তন সৈন্যেরা ইহা পরিচালনা করিয়াছে।

আচার্য কৃপালনীর বিবৃতির পর উল্লেখযোগ্য শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বিবৃতি। ২২শে অক্টোবরের বিবৃতিতে শরৎচন্দ্র বাঙালার যুব-সমাজের নিকট আবেদন করিয়া বলেন, যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি দেশে

অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছে যুব-সম্প্রদায় তাহাকে প্রতিহত করুক। নোয়াখালির ঘটনা সম্বন্ধে বাঙলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ বিলাতে যে এক রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন, পার্লামেন্টের আলোচনায় তাহা প্রকাশ পায়। ইহাতে দেখা যায় ঘটনার গুরুত্বকে লঘু করিবার জন্য গভর্ণর সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন। ২৩শে অক্টোবরের বিবৃতিতে শরৎচন্দ্র গভর্ণরের বিকৃত বিবরণ খণ্ডন করিয়া বলেন— নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চলে স্থানীয় মুসলমানসমাজ যে সমষ্টিগত ভাবে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; গভর্ণর বলিয়াছেন মৃতের সংখ্যা শতকের কোঠায় নীচের দিকে থাকিবে; কিন্তু বিভিন্ন সূত্র হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় উহা সহস্রের কোঠায় যাইবে ; উপদ্রুত অঞ্চলে উৎপীড়িতগণ পুলিশের সাহায্য চাহিয়াও পায় নাই ; একমাত্র ত্রিপুরা জেলাতেই উপদ্রুত অঞ্চলের এলাকা চারিশত বর্গ মাইল হইবে। শরৎচন্দ্রের বিবৃতির সহিত ভারত গভর্ণমেন্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিকট কুমিল্লা হইতে প্রেরিত শীকামিনীকুমার দত্তের একটি বিবরণও প্রকাশিত হয়। তিনিও স্থানীয় শাসন কর্মচারীদের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে বিশেষ অভিযোগ করেন।

নারীহরণ ও নারীনির্যাতনঃ

গবর্ণরের নিকট শ্রীমতী লীলা রায়ের খোলাচিঠি এবং শ্রীমতী রেণুকা রায়ের ও শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর বিবৃতি কয়টিতে নারীনিগ্রহের কথাটাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মিস মুরিয়েল লিষ্টারের বিবৃতির মধ্যেও নারী নির্যাতনের মর্মস্পর্শী বর্ণনা রহিয়াছে। গবর্ণর যে বিলাতে প্রেরিত স্বীয় রিপোর্টে নারী-নির্যাতনের কথা উল্লেখ করেন নাই তজ্জন্য কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া শ্রীমতী লীলা রায় স্বীয় খোলা চিঠিতে প্রশ্ন করিয়াছেন—'নারী ও পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক দল যাহাতে উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীদিগকে উদ্ধার করিতে পারে তজ্জন্য সামরিক রক্ষী দিতে আপনি সম্মত আছেন কি?

৮ই নভেম্বর প্রথম বিবৃতিতে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী বলিতেছেন যে, ব্যাপক অত্যাচার বন্ধ হইয়া থাকিলেও নারীনিগ্রহ ও অন্যান্য অসৎকার্য্য গ্রামের অভ্যন্তরে তখনও চলিতেছে। শাসনকর্তৃপক্ষ দুর্বৃত্তগণকে গ্রেপ্তার না করিয়া তাহাদের অপরাধের প্রমাণ লোপ করিবার সুযোগ দিতেছেন। পক্ষান্তরে দুর্বৃত্তগণ আপনাদের গৃহে ছোটখাট আগুন লাগাইয়া হিন্দু সমাজকেই তজ্জন্য দোষী করিতেছে এবং পুলিশ হিন্দুদের মধ্য হইতে বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ১৬ই নভেম্বর তারিখে চৌমুহনীতে এবং ১৭ই নভেম্বর দমদম বিমানঘাটীতে পৌঁছিয়া শ্রীমতী সুচেতা উল্লিখিত অভিমতেরই পুনরাবৃত্তি করেন, আরও বলেন যে উপদ্রুত অঞ্চলে তখনও লোক অবরুদ্ধ রহিয়াছে; অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হয় নাই।

১৩ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীমতী রেণুকা রায় উপদ্রুত অঞ্চল সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতার কথা বলেন, তাহা শ্রীমতী সুচেতার অভিমতকেই সমর্থন করে। তিনি বলেন, ব্যাপক আক্রমণের পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে হত্যা, গৃহদাহ, নারীনিগ্রহ যাহা চলিতেছে তাহার সংখ্যা যথেষ্ট। শ্রীমতী রেণুকার বিবৃতিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য কথা আছে –

(১) "গ্রাম হইতে মিলিটারী চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই নারী অপহরণ আরম্ভ হইয়া যায় ; কয়েকদিন এইভাবে থাকিবার পর পুনরায় মিলিটারী আসিলে ইহাদিগকে স্বগৃহে রাখিয়া যাওয়া হয়।"

(২) উপদ্রবের মূল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, প্রথমে শান্তিকমিটি গঠন করিয়া লোকের মনে একটা ভ্রান্ত নিরাপত্তার ভাব সৃষ্টি করা হয়। এই সকল কমিটি মুসলীম লীগের নামে চাঁদা আদায় করে। চাঁদা দিয়া লোকে যখন আপনাদিগকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ মনে করিয়াছে ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ আক্রমণ ঘটিয়াছে।

(৩) নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা রায় বলেন, "নারীহরণ ও নারীধর্ষণের বহু ঘটনার সংবাদ আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে পৌঁছিয়াছিল। সাক্ষ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, ইহাদের অধিকাংশই হিন্দুসমাজের তপশীল ও নিম্নশ্রেণীভুক্ত। অবশ্য কতকগুলি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট পরিবারের নারীরাও এইভাবে নিগৃহীত হইয়াছেন এবং প্রথম আক্রমণ তাহাদের উপরেই পড়িয়াছে। ১১/১২ বৎসরের বালিকা হইতে ৪৫ বৎসরের প্রৌঢ়া পর্যন্ত কেহই এই নিগ্রহ হইতে অব্যাহতি পায় নাই।"

মিস্ মুরিয়েল লিষ্টারের বিবৃতি স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিতেছি। তৎকালীন নিষেধাজ্ঞার ফলে ইহার বিবৃতি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইতে পারে নাই। তথাপি যতটুকু প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেই নারীনিগ্রহ ও অন্যান্য অপরাধের কথা বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপদ্রুত অঞ্চলে রামগঞ্জ থানার দত্তপাড়ায় দেওয়ানজীবাড়ীর সাহায্যকেন্দ্রে বসিয়াই তিনি বিবৃতি রচনা করিয়াছেন। নারীনিগ্রহ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দশা হইয়াছে নারীদের। ইহাদের অনেকের স্বামীকে ইহাদের সম্মুখেই নিহত করা হইয়াছে, পরে ইহাদিগকে ধর্মান্তরিত করিয়া স্বামীহন্তাদের মধ্যে কেহ ইহাদিগকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়াছে। ইহাদের আকৃতি দেখিলে মনে হয় না যে জীবনের কোনো লক্ষণ আছে। যাহাদিগকে ইতিমধ্যেই মুসলমান গৃহের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে স্বেচ্ছাসেবক বা সরকারী কর্মচারী কেহই তাহাদিগকে বাহির করিতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে বলা হইয়াছে যে, তাহারা স্বেচ্ছায় রহিয়াছে একথা না বলিলে তাহাদের পিতৃবংশ নির্মূল করা হইবে। বলপূর্বক ধর্মান্তর, গোমাংস ভক্ষণে বাধ্য করা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সমস্ত আক্রমণ পূর্ব্ব পরিকল্পিত।" এই প্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, "গৃহের উপর পেট্রোল ছিটাইয়া পরে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। রেশনের অধীন এই দাহ্য পদার্থটি সরবরাহ করিল কে? গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এত ষ্টিরাপ পাম্প আনিল কে? অস্ত্র সরবরাহ করিল কে ? দুর্বৃত্তগণ মনে করিতেছে, এ অঞ্চলে তাহাদের শাসন সংস্থাপিত হইয়াছে, কোথাও তাহাদের ভয়ের চিহ্ন দেখিলাম না।"

ভারত গভর্ণমেন্টের নিস্ক্রিয়তাঃ

নোয়াখালির ঘটনার জের চলিতে চলিতেই বিহারে তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নোয়াখালির ঘটনা সম্পর্কে তৎকালীন ভারত গবর্ণমেন্টে [ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বব্যবস্থাস্বরূপে সে সময়ে একটা "মধ্যবর্তী গবর্ণমেন্ট" গঠিত হইয়াছিল। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ মিলিয়া উহা চালাইতেছিলেন।] কংগ্রেসনেতৃবৃন্দ নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকেন। এমন কি জিজ্ঞাসিত হইয়াও স্বরাষ্ট্রসচিব সর্দার বল্লভভাই বলেন প্রদেশের ব্যাপারে তাহারা হস্তক্ষেপ না করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু বিহারের ঘটনায় উপদ্রবকারিগণকে দমনের জন্য তাহারা অতিমাত্রায় সক্রিয় হইয়া উঠেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ভীতিপ্রদর্শন করেন। বিহারের অবস্থা ইহাদের এই সক্রিয়তার ফলে দ্রুত আয়ত্তে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য বেহিসাবী গ্রেপ্তার ও মিলিটারী কর্তৃক বেপরোয়া গুলী চালনা এই উভয়বিধ উপায় তাহাদিগকে অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেন্টের অন্তর্ভুক্ত কংগ্রেস-প্রধানগণ ইহার দায়িত্ব লইয়াছিলেন। প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিব না বলিয়া বসিয়া থাকেন নাই। বাঙলায় ও বিহারে ভারত গবর্ণমেন্টের নীতির এই পার্থক্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থিত হইলে পণ্ডিত জওহরলাল এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে বাধ্য হন। ২রা নভেম্বর "মধ্যবর্তী গভর্ণমেন্টের" চারিজন সদস্য [পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, মিঃ লিয়াকত আলি ও সর্দার আবদুর রব নিস্তার।] গান্ধীজীর সহিত আলোচনার জন্য কলিকাতায় উপস্থিত হইলে দমদম বিমানঘাঁটিতে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, "গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আমি যে ভাবে নীরব রহিয়াছি, মনের প্রবল আবেগ সত্ত্বেও এইরূপভাবে নীরবতা রক্ষা ইতিপূর্বে আমি কখনো করি নাই। আমার এই নীরবতার কেহ যদি ভুল অর্থ করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে জানেন না। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে এবং বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা এত ভয়ঙ্কর যে মৃত ব্যক্তিও শিহরিয়া উঠিবে। আমি মৃত নহি, যথেষ্ট জীবন্ত।"

ইহার পর ১৪ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় আইন সভায় এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহেরু পুনরায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেন। গবর্ণমেন্টের আচরণ সম্বন্ধে যে সমালোচনা হইয়াছে তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, "প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও কার্যতঃ যাহা কর্তব্য তিনি তাহা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।" পূর্ববঙ্গের ঘটনায় অপহৃতা ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত নারীদের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"ইহা স্বভাবতই গুরুতর ব্যাপার। ইহা অধিকতর গুরুতর এইজন্য যে, সমগ্র ভারতবর্ষের উপরে ইহার প্রতিক্রিয়া হইবে। অপহৃতাগণকে তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নিকট ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করিতে হইবে। তাহার পূর্বে পূর্ববঙ্গে পুনর্বসতির প্রশ্ন উঠিতে পারে না।"

উদ্ধারকারী অফিসার আক্রান্তঃ

৯ই নভেম্বর প্রকাশিত নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীআশুতোষ লাহিড়ীর বিবৃতিতে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ আছে। নোয়াখালির উপদ্রব সম্বন্ধে রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য বাঙলা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রেরিত রঞ্জিত গুপ্ত, আই. সি. এস. ২রা নভেম্বর রাত্রিতে উপদ্রুত, অঞ্চল হইতে একটি পরিবারকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছিলেন, পথে দলবদ্ধ দুর্বৃত্তগণ তিনবার তাহাকে আক্রমণ করে এবং প্রত্যেকবার গুলী চালাইয়া তিনি রক্ষা পান [রামগঞ্জ থানার দত্তপাড়ার নিকটে ইহা ঘটে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত উদ্ধারপ্রাপ্তদিগকে দত্তপাড়ার সাহায্যকেন্দ্রে লইয়া আসিতেছিলেন।]

নোয়াখালি-ত্রিপুরা ভ্রমণ করিয়া আসিয়া পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জ যে বিবৃতি দেন তাহা ১০ই নভেম্বর প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত কুঞ্জরুর মতে মুসলীম লীগের উগ্রপন্থী নেতাগণ ইসলামের নামে মুসলমানদিগকে ক্ষেপাইয়া অসহায় হিন্দুদিগকে আক্রমণে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। পূর্ব হইতে বিপদের আশঙ্কা বুঝিয়া হিন্দুগণ গভর্ণমেন্টের নিকট রক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন করিলেও বাঙলা গভর্ণমেন্ট উহা উড়াইয়া দিয়াছেন। ঘটনার গুরুত্ব লঘু করিবার জন্য জেনারেল বুসার ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্নি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, পণ্ডিত কুঞ্জ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট যখন বলপূর্ব্বক বিবাহিতা একটি বালিকাকে উদ্ধার করেন, তখন পণ্ডিত কুঞ্জরু নিজেই তাহার সঙ্গে ছিলেন। বলপূর্বক ধর্মান্তরের দৃষ্টান্তস্বরূপে তিনি ভারতীয় বাহিনীর এক কমিশন-প্রাপ্ত হিন্দু অফিসারের দুর্গতির কথা উল্লেখ করেন। ইনি ছুটীতে আসিয়াছিলেন এবং উপদ্রবের সূচনার সময়ে গৃহেই ছিলেন। ইহাকে বাহিরে আসিতে বা কাহাকেও কোনো সংবাদ পাঠাইতে দেওয়া হয় নাই; ইহার গৃহ লুণ্ঠিত হয়, অস্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং একমাত্র ইহার মাতা ব্যতীত পরিবারের অপর সকলকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। মিলিটারী গিয়া উদ্ধার না করা পর্যন্ত ইনি সপরিবারে গৃহে বন্দী ছিলেন।

সরকারী সাফাইঃ

বেসরকারী মহল হইতে এই সকল বিবৃতি যখন প্রকাশিত হইতেছিল তখন সরকারী কর্তৃপক্ষ বসিয়া থাকেন নাই, তাহারাও স্বীয় অভিপ্রায়ানুযায়ী বিবৃতিসমূহ প্রকাশ করিতেছিলেন। বে-সরকারী বিবৃতিসমূহ যেমন ঘটনার স্বরূপ ও উহার পরিণামের কথা জনসমাজে প্রকাশ করিতেছিল, সরকারী বিবৃতিসমূহও তেমনি ঘটনার গুরুত্ব এবং গভর্ণমেন্টের ও তাহাদের কর্মচারীদের দায়িত্ব লঘু করিতে চাহিতেছিল। বে-সরকারী বিবৃতিসমূহ কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি। যে সকল বিবরণ হইতে সরকারী মনোভাব বুঝিতে পারা যায় তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি :-

(১) গভর্ণর ও মিঃ সুরাবর্দী কর্তৃক একত্রে বিমান হইতে উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন সম্বন্ধে বাঙলা গভর্ণমেন্টের সরকারী বিবৃতি (২০/১০/৪৬)

(২) "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকার রিপোর্টারের নিকট চট্টগ্রাম হইতে প্রদত্ত মিঃ সুরাবর্দীর ও পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ টেলরের বিবৃতি (২০/১০/৪৬)

(৩) এই পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে মিঃ সুরাবদীর নিজস্ব বিবৃতি (২১/১০/৪৬)

(৪) পার্লামেন্টে বাঙলা গভর্ণরের রিপোর্টের আলোচনা (২২/১০/৪৬)

(৫) নোয়খালির সদ্যনিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্ণির ডায়েরী ("ষ্টেটসম্যান" ২৩/১০/৪৬) ও তাহার বিবৃতি ("ষ্টেটসম্যান" ২৭/১০/৪৬)

(৬) মিঃ সুরাবর্দীর তৃতীয় বিবৃতি (২৫/১০/৪৬)

(৭) সাংবাদিক বৈঠকে জেনারেল বুসারের বিবৃতি (২৭/১০/৪৬)

(৮) বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের বিমানভ্রমণের বিবরণ (৩/১১/৪৬)

["ষ্টেটম্যান" ব্যতিরিক্ত অন্যান্য তারিখগুলি "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকার কলিকাতা সংস্করণ]

এই সকল বিবৃতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় মোটের উপর ঘটনার গুরুত্ব লঘু করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু স্বীকৃতি যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু মূল অভিপ্রায়টা অন্যরূপ। ২০শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত বিবৃতিতেই বাঙলা গভর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে "নোয়াখালির অবস্থা আয়ত্তে আসিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।"

মিঃ সুরাবর্দীর প্রথম বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে নোয়াখালি-ত্রিপুরায় যাহা ঘটিতেছে তাহা গুণ্ডামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং মুসলীম লীগ ইহার মধ্যে নাই। ইন্সপেক্টর জেনারেলের বিবৃতিতেও উপদ্রবের ব্যাপকতা বা ভয়াবহতার পরিচয় পাই না। কিন্তু উহাতে একটি উল্লেখ যোগ্য স্বীকৃতি আছে -

"The hooligans were armed with guns and various types of other weapons and they were still defiant and not afraid to face the police and the military!"

অর্থাৎ "উপদ্রবকারিগণ আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য নানাবিধ অস্ত্রে সজ্জিত ছিল। তাহারা তখনও বেপরোয়া ; এমন কি পুলিশ ও মিলিটারীর সম্মুখীন হইতেও তাহারা ভীত হয় নাই।"

গভর্ণর বারোজ সাহেব বিলাতে কি রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। কেবল পার্লামেন্টের আলোচনার বিবরণেই কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে গভর্ণর জানাইয়াছেন নোয়াখালিতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা কোন ব্যাপক আক্রমণ নহে, মাত্র একদল গুণ্ডার কার্য্য ; মৃতের সংখ্যা শতের কোঠায় খুব নীচের দিকে থাকিবে, তবে সম্পত্তিনাশ অনেক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া অন্য কোন অপরাধের উল্লেখ গভর্ণরের রিপোর্টে নাই।

"স্টেটসম্যান" পত্রিকায় মিঃ ম্যাকিনার্ণির যে ডায়েরী প্রকাশিত হইয়াছে তার উদ্দেশ্য বিচিত্র। মিঃ ম্যাকিনার্ণি কার্যভার লন ১৬ই অক্টোবর তারিখে। কিন্তু ২৩শে অক্টোবর প্রকাশিত ডায়েরীতে তিনি প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছেন যে কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র অঞ্চলময় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে গোলযোগ থামিয়া গিয়াছে। ইহার পর প্রকাশিত তাহার বিবৃতির বিশেষত্ব এই যে উহাতে তিনি স্ত্রীলোকদের উপর কোনরূপ অত্যাচারের কথা একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন। মিঃ সুরাবর্দীর তৃতীয় বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন যে, ১৭ই অক্টোবরের পর নোয়াখালিতে আর কোন ঘটনা ঘটে নাই, অবস্থা নিশ্চিতরূপে আয়ত্তে আসিয়া গিয়াছে ; কেবল সংবাদপত্রসমূহ উহা লইয়া বাড়াবাড়ি করিতেছে বলিয়াই লোকে ভয়ত্রস্ত হইয়া ৰাড়ী ছাড়িয়া পালাইতেছে। লর্ড ওয়াভেলের বিমান-ভ্রমণের পর যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, রন্ধনশালার ধূম ব্যতীত বড়লাট আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইহা বিচিত্রও নহে। যখন ঘটনা সদ্য সদ্য সংঘটিত হইতেছে তখনও গভর্ণর ও মিঃ সুরাবদী বিমান হইতে কিছু দেখিতে পান নাই। লর্ড ওয়াভেল গভর্ণরকে সঙ্গে লইয়াই গিয়াছিলেন এবং তৎকালে গৃহদাহের বহ্নিশিখা নিভিয়া গিয়াছে।

সাংবাদিক বৈঠকে জেনারেল বুসারের বিবৃতি সম্বন্ধে "পুনর্বসতি ও জেনারেল বুসার" শীর্ষক পরবর্তী এক অধ্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এখানে তদতিরিক্ত কয়েকটি কথা বলিব। প্রথমবার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পর সরকারী মহলের সহিত আমার প্রথম আলাপ জেনারেল বুসারের সাংবাদিক বৈঠকে। আলাপ করিয়া বুঝিলাম অবস্থার গুরুত্ব লঘু করিবার যে মনোভাব সরকারী কর্মচারীদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল সেই মনোভাবের দ্বারাই তিনি চালিত হইয়াছেন। উপদ্রব দমনের জন্য মিলিটারীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া কুমিল্লা হইতে দিল্লীতে টেলিফোন করিয়া শরৎচন্দ্র সর্দার বল্লভভাইকে জানাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহারই ফলে জেনারেল বুসার প্রেরিত হন। কিন্তু তাহার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি পালন করেন নাই। জেনারেল বুসারের নিকট হইতে বিশেষভাবে এইটুকু জানা যায় যে সেনাবাহিনী উপদ্রুত অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করিলে উপদ্রবকারীরা বাধা, দিতেছে এবং রীতিমত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও স্থানীয় শাসনকার্য্য মিলিটারীর হাতে লইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। ইতিপূর্বে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, প্রাক্তন সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রমণ পরিচালিত হইয়াছিল। জেনারেল বুসারের সহিত প্রশ্নোত্তর-প্রসঙ্গে প্রকাশ পায় যে, সৈন্যদলে কাজ করিতেছে এমন ব্যক্তিরাও আক্রমণে যোগ দিয়াছিল। চিঠিপত্র পরীক্ষা হইতে ইহা ধরা পড়ে।

ইউনাইটেড প্রেসের মারফৎ প্রচারিত এবং ২৯শে অক্টোবর "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের বিবৃতির একটু বিশেষত্ব আছে। তিনি তখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের শাসনপরিষদে মুসলীম লীগ মনোনীত সদস্য এবং লীগের পক্ষ হইয়াই তিনি উপদ্রবের স্থল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়াছেন। ১৯শে অক্টোবর বঙ্গীয় মুসলীম লীগের ওয়ার্কিং কমিটী উপদ্রবস্থল পরিদর্শনের জন্য প্রতিনিধিপ্রেরণের সিদ্ধান্ত করেন, ২২শে অক্টোবর শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও অন্যান্য কয়েকজন লীগপ্রধান কলিকাতা হইতে বিমানযোগে যাত্রা করেন, ২৩শে অক্টোবর তাহারা ফিরিয়া আসেন, ২৪শে অক্টোবর রিপোর্ট দেন এবং ২৫শে অক্টোবর তাহা প্রকাশিত হয়। সদ্য পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতার পর শ্রীযুক্ত মণ্ডল কলিকাতায় ফিরিয়াই 'এসোসিয়েটেড, প্রেসের' প্রতিনিধির নিকট বলেন--"দুর্বৃত্তেরা যাহাকে পাইয়াছে তাহারই ধর্মনাশ করিয়াছে। একটী স্ত্রীলোকের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। সে বলিল—দুর্বৃত্তেরা আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া কন্যাকে হরণ করিয়াছে।" কিন্তু মণ্ডল মহাশয়ের এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পরিদর্শকগণের পক্ষ হইতে লীগ সেক্রেটারী মহাশয় যে রিপোর্ট দিলেন এবং লীগ ওয়ার্কিং কমিটীর অনুমোদনে যাহা প্রকাশিত হইল তাহাতে তাহারা বলিলেন—"প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারে এমন একটী লোকও আমরা পাই নাই," পুনরায় বলিলেন—"তপশীলী হিন্দুসমাজের এক ব্যক্তিও নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই"। নারীহরণের দোষ ক্ষালনের জন্য বলিলেন-"এইরূপ অপহৃতা হিন্দুনারীর পরিবর্তে হিন্দুদিগকে মুসলমান নারী দেওয়া হইয়াছিল।" এই রিপোর্টে এবং বঙ্গীয় মুসলীম লীগের এতৎসংক্রান্ত প্রস্তাবে ঘটনার গুরুত্ব এবং মুসলমান সমাজ ও মুসলীম লীগের দায়িত্ব লঘু করিবার চেষ্টার বিষয় ইতিপূর্বে আচার্য কৃপালনীর বিবৃতিসমূহের আলোচনাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি।

বঙ্গীয় মুসলীম লীগের এই রিপোর্ট প্রকাশের পরেও শ্রীযুক্ত মণ্ডল ২৯শে অক্টোবর তারিখে 'ইউনাইটেড প্রেসের' মারফতে প্রচারিত তাহার বিবৃতিতে বলিয়াছেনঃ - "Any man irrespective of caste and creed will be shocked at the untold misery and sufferings of the victims of the riots at Noakhali and Chandpur. Any language is inadequate to condemn the ruthless barbarism of the hooligans at Noakhali and Chandpur." অর্থাৎ, "জাতিধর্মনির্বিশেষে যে কোন লোক নোয়াখালি ও চাঁদপুরের উপদ্রব পীড়িত জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা দেখিয়া মর্মাহত হইবে। নোয়াখালি ও চাঁদপুরে উপদ্রবকারিগণের নির্মম বর্বরতা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই।" [মণ্ডল মহাশয়ের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী "Statesman" পত্রিকার সম্পাদকের নিকট যে পত্র লেখেন তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ৬ই নভেম্বর ইহা প্রকাশিত হয়ঃ-

"Sir, you lately published presumably from an official source an account of the Viceroy's air tour of Noakhali and Tippera Districts in East Bengal. Referring to an incident where "wisps of smoke ascended, seemingly from charred debris of huts" the account stated that "closer investigation identified domestic cooking”. Then came the sentence: "Wrecked sights were rare and needed careful piloting to seek and find."

I do not suppose any one would maintain that arson was continued on Saturday last in the affected area. The reference to deceptive wisps of smoke in this context therefore seemed an unworthy attempt at humouring in a situation where nothing but sympathy was called for.

I fervently hope that the Viceroy's brief aerial flight over some of the affected spots will not be utilised for the purpose of minimising the gravity of the situation or supporting the inaccurate statements of Sir Frederick Burrows which were read out in Parliament a few days ago. Were such an attempt made even now it would only exasperate the affected community and might increase the difficulty in the way of restoring peace in the country.

I should like to quote the following from a press interview reported to have been granted by Mr. J. N. Mandal, Law Member of the present Government of India, who visited the affected areas in the company of some of his Muslim League colleagues: “Any man irrespective of caste or creed will be shocked at the untold misery and sufferings of the victims of the riots at Noakhali and Chandpur. Any language is inadequate to condemn the ruthless barbarism of the hooligans of Noakhali and Chandpur.”

Mr. Mandal, I understand, has just arrived at Delhi to join his office. Will the Viceroy get a detailed account from him of what he actually saw? After all Mr. Mandal cannot be accused of bias in favour of Hindus.

(New Delhi, Nov. 3, K. C. Neogy; M. L. A.(Central)]

তিনি তখন দ্বিতীয়বার উপদ্রবস্থল পরিদর্শনে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আশ্চর্য্য এই, ইহার পর এই ব্যক্তিই প্রকাশ্যে মুসলীম লীগের প্রচারকার্যে যোগ দেন এবং লীগ নেতৃবৃন্দের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে, তপশীলী হিন্দু সমাজের উপর কোনই অত্যাচার হয় নাই। বলা বাহুল্য হিন্দুসমাজের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার জন্যই বিশেষ করিয়া এই প্রকাণ্ড মিথ্যা কথাটা প্রচার করা হইতেছিল। কুমিল্লা হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে নির্বাচিত তপশীলী সদস্য শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র দাস ১৪ই নভেম্বর তারিখে এক বিবৃতি দিয়া মণ্ডল মহাশয়ের এই উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচারকার্যের প্রতিবাদ করেন। চাঁদপুর হইতে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, “উপদ্রবকারিগণের ধ্বংসকার্যে স্থানীয় তপশীল সমাজের দুর্দশা লঘু করিবার জন্য মণ্ডল মহাশয় যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা নিতান্তই সত্যের বিরোধী। আমি এই ধ্বংস কার্য্যের প্রত্যক্ষদর্শী। চাঁদপুর মহকুমার হাইমচর অঞ্চলে কুড়ি হাজারের অধিক তপশীল সমাজের জনসাধারণের বাস। ইহা অগ্নিকাণ্ডে একেবারেই বিধ্বস্ত হইয়াছে ; গৃহসমূহ লুন্ঠিত হইয়াছে, নারীর মর্যাদা নষ্ট করা হইয়াছে, কতগুলি বালিকার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, বহুসংখ্যক নারীধর্ষণেরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কতগুলি লোক দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছে, তপশীল সমাজভুক্ত প্রায় পনের হাজার স্ত্রীপুরুষ নিরাশ্রয় হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।”

মালব্যজীর মহাপ্রয়াণঃ

নোয়াখালি–ত্রিপুরার উপদ্রব এবং তৎসম্বন্ধে এই সকল প্রচারকার্য্য যখন চলিতেছিল সেই সময়ে ইহাদের অন্তরালে ভারতবর্ষের ইতিহাসের আর এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিতেছিল। তাহা হইল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর মৃত্যু। মালব্যজী এই সময় বয়সে ও রোগে জীর্ণ। নোয়াখালি–ত্রিপুরার অত্যাচার–কাহিনী তাহার নিকট পৌঁছিবামাত্র এই বর্ষীয়ান দেশসেবকের চক্ষু হইতে যে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, শেষ পর্যন্ত তাহা ক্ষান্ত হয় নাই। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁহার জীবনের সায়াহ্নকাল যন্ত্রণাময় হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুসমাজকে আপনার সম্বন্ধে সচেতন ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে উদ্বুদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিয়া ১লা নভেম্বর মালব্যজী

এক আবেদন প্রচার করেন [৯ই নভেম্বর, ১৯৪৬ তারিখের "হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকায় প্রকাশিত।] ইহাই দেশের প্রতি ও জাতির প্রতি তাহার দীর্ঘ জীবনের উপলব্ধির শেষ নিবেদন ও শেষ বাণী। নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনার সংবাদে মালব্যজীর শরীর ও মন যে ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা তিনি আর সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সুগভীর বেদনায় ধীরে ধীরে স্তিমিত হইতে হইতে ১৩ই নভেম্বর তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়। ইউরোপের ইতিহাসে বলে, "Austerlitz Killed Pitt" অষ্টার্লিজের যুদ্ধে নেপোলিয়নের নিকট পরাজয়ের আঘাতেই বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পিটের প্রাণবিয়োগ ঘটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তেমনি লিখিত হইবে, "Noakhali Killed Malaviya" নোয়াখালিতে হিন্দুসমাজের উপর অত্যাচার-কাহিনীর অসহ বেদনাই মালব্যজীর জীবনান্তের কারণ হইয়াছিল। নোয়াখালি-ত্রিপুরার ধ্বংস-কাহিনী বর্ণনা করিতে হইলে তাহার পটভূমিকায় মালব্যজীর মহাপ্রয়াণের দৃশ্য অপরিহার্যভাবেই জাগিয়া উঠিবে।

গান্ধীজীর আশ্বাসঃ

চতুর্দিকব্যাপী নিরাশার এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিকিরণ করিতেছিলেন একমাত্র গান্ধীজী। গভীর বেদনা আপনার বুকে চাপিয়া উদাত্তকণ্ঠে বারবার সমাজকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিতেছিলেন, "ভয়ের নিকট আত্মসমর্পণ করিও না, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইও না।"

নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনা প্রকাশ হইবার প্রথম দিন হইতেই তাহার আশ্বাসবাণীতে, প্রার্থনান্তিক ভাষণে ও "হরিজন পত্রিকার" মন্তব্যে নানাভাবে তিনি উৎপীড়িত জনসমাজকে ইহাই শুনাইয়াছিলেন। ১৫ই অক্টোবর দিল্লীতে তাহার প্রার্থনান্তিক ভাষণে সর্বপ্রথম ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৭ই অক্টোবরের প্রার্থনাসভায় তিনি বলেন হত্যার সংবাদ অপেক্ষাও স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করিবার ও অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার সংবাদে তিনি অধিকতর ব্যথিত হইয়াছেন; কেহ কেশাগ্র স্পর্শ করিবার পূর্বে কি করিয়া মৃত্যুবরণ করিতে হয় তাহা নারীগণকে শিক্ষা করিতে হইবে। ১৮ই অক্টোবরের ভাষণে গান্ধীজী নারীদিগকে উপদেশদান প্রসঙ্গে বলেন, সম্মাননাশের পূর্বে তাহারা যেন বিষগ্রহণ করেন। ১৯শে অক্টোবরের ভাষণে পুনরায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। মৃত্যু বরণ করিয়া কি প্রকারে মর্যাদা রক্ষা করিতে হয়, তাহাই গান্ধীজী বিশেষভাবে বলিয়াছেন। ২১শে অক্টোবর "এ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার" প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে গান্ধীজী সুগভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করিয়া বলেন, পূর্ববঙ্গের উপদ্রব দমন করা বাঙলার মুসলীম লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের উচিত ছিল, তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহা পারিতেন বলিয়াই তাহার বিশ্বাস। ২৪শে অক্টোবর তারিখের ভাষণে নোয়াখালি-ত্রিপুরার অত্যাচারের প্রতিবাদে দিল্লীর স্থানীয় জনসাধারণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের উত্তরে গান্ধীজী বলেন, বাঙলার ঘটনায় বিচলিত হয় নাই এমন লোক থাকিতে পারে না। ভারত গভর্ণমেন্টের (তৎকালে কংগ্রেস ও লীগ কর্তৃক পরিচালিত) প্রত্যেক সদস্য ইহাতে বিচলিত হইয়াছেন। এই দিন মহাত্মাজীর মন এত বিচলিত হইয়াছিল যে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা পরিত্যক্ত হয়। তিনি নারীদিগকে ভয়হীন হইতে উপদেশ দেন এবং সম্মানহানির পূর্বে মৃত্যু বরণ করিতে বলেন; কারণ, দলবদ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আত্মরক্ষার চেষ্টাও নিরর্থক। ২৭শে অক্টোবরের প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী জানান, তিনি পরদিন দিল্লী হইতে বাঙলায় রওনা হইবেন। নারী-নির্যাতনের যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে তিনি মর্মাহত হইয়াছেন, নারীদের অশ্রু মুছাইতে এবং তাহাদের মনে বল সঞ্চার করিতেই তিনি যাইতেছেন। ২৯শে অক্টোবর মহাত্মাজী কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছান এবং সেই তারিখেই বৈকালে প্রার্থনাসভায় বলেন তিনি কলিকাতায় থাকিবার জন্য আসেন নাই, তিনি সদ্য সদ্যই নোয়াখালিতে রওনা হইবেন, সেইখানেই তাহার স্থান; পরে ভগবান তাহাকে যেভাবে চালিত করেন তিনি সেইভাবেই চলিবেন। ৩০শে তারিখের প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী ঐক্যের জন্য আবেদন করেন এবং বলেন যে, ১লা নভেম্বর তারিখে তিনি নোয়াখালি রওনা হইবেন।

কিন্তু দ্রুত নোয়াখালি গিয়া পৌঁছাইবার এই আকুল আগ্রহ সত্ত্বেও দ্রুত যাত্রা করা মহাত্মাজীর পক্ষে সম্ভব হইল না। বাঙলা গভর্ণমেন্টের তৎকালীন পরিচালকগণ কখনও আলোচনার অজুহাতে, কখনও উদ্যোগ-আয়োজনের অজুহাতে, কখনও আসন্ন বক্‌রিদের (বকরি ইদের) অজুহাতে অনুরোধ করিয়া গান্ধীজীর যাত্রার দিন পিছাইয়া দিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নোয়াখালি-ত্রিপুরার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিহারে অগ্নিকাণ্ড সুরু হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজী নোয়াখালি না গিয়া যাহাতে বিহারে যান তজ্জন্যও সুকৌশলে চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গেল। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, একসময় মনে হইয়াছিল গান্ধীজী হয়তো নোয়াখালি যাত্রা স্থগিত রাখিয়া বিহারেই যাইবেন। পূর্বেই বলিয়াছি বিহারের অবস্থা দ্রুত আয়ত্তে আসিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক অগ্ন্যুৎপাত যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে অকস্মাৎ আরম্ভ হইয়াছিল তেমনি দ্রুত উহা শান্ত হইয়া গেল। একদিকে, উপদ্রব দ্রুত শান্ত না হইলে গান্ধীজীর প্রয়োপবেশনে মৃত্যুবরণের সঙ্কল্প এবং অন্যদিকে ভারত গবর্ণমেন্টের প্রবল ও ব্যাপক প্রতিকারব্যবস্থা—এই উভয়ের চাপে বিহারের উপদ্রবকারীরা শান্ত ও নিরস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গান্ধীজীকে বিহারে পাঠাইবার চেষ্টা হইতে বাঙলার লীগনায়কেরা নিরস্ত হইলেন না। শুধু টালবাহানা করিয়া এই ভাবে গান্ধীজীর যাত্রা বিলম্বিত করার একটা মাত্র অর্থই লোকে বুঝিয়াছিল—উপদ্রুত অঞ্চলে গান্ধীজীর পদার্পণের পূর্বেই বর্বরতার সাক্ষ্যপ্রমাণসমূহ যথাসম্ভব অপসারিত করা। ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল আরও একটা বিশেষ কারণে—এতদিন উপদ্রুত এ অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগ বাহিরের লোকের পক্ষে একপ্রকার অবরুদ্ধই ছিল। গান্ধীজীর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সে অবরোধ ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং বাহিরের সহস্র দৃষ্টি যুগপৎ উপদ্রুত অঞ্চলের উপরে গিয়া পড়িবে। যাহাই হউক, সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর যাত্রা সম্ভব হইল। গান্ধীজী বিহারে না গিয়া নোয়াখালিতে যাওয়া সম্বন্ধে দৃঢ় হইয়া রহিলেন এবং ৬ই ডিসেম্বর প্রাতে স্পেশাল ট্রেণযোগে সোদপুর হইতে নোয়াখালি রওনা হইয়া গেলেন। মন্ত্রী মিঃ সামসুদ্দীন, প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ নসরুল্লা এবং মিঃ আবদুর রসীদ এই তিন জনও মহাত্মাজীর সঙ্গে রহিলেন। রাত্রি সাড়ে আটটায় চাঁদপুরে পৌঁছিয়া মহাত্মাজী তথায় রাত্রি কাটাইলেন এবং তৎপরদিন প্রাতে স্পেশাল ট্রেণ যোগে রওনা হইয়া দ্বিপ্রহরে চৌমুহনীতে পৌঁছিলেন।

৮ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে চৌমুহনীর এক সভায় মহাত্মাজী হিন্দু-মুসলমান সকলের নিকট ঐক্য ও সম্প্রীতির আবেদন জানান।

৯ই ডিসেম্বর তারিখে রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত গোপের বাগ, দত্ত পাড়া, ও অপর একটি গ্রামে ধ্বংস ও হত্যার চিহ্ন পরিদর্শন করেন।

১০ই ডিসেম্বর তারিখে চৌমুহনী হইতে দত্তপাড়ায় শিবির স্থানান্তরিত করেন, এবং পর পর কয়দিন নয়াখালা, সোনাচাকা, খিলপাড়া, গোয়াতলী, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। তখন হত্যাকাণ্ডের পর একমাস হইয়া গিয়াছে কিন্তু তখনও উপদ্রুত স্থানে নিহতদের দগ্ধাবশেষ ও অস্থিপঞ্জর পড়িয়া আছে।

১৩ই ডিসেম্বর মহাত্মাজী তাহার শিবির উঠাইয়া দিলেন, সহকর্মীদের প্রত্যেককে এক এক এক গ্রামে গিয়া বসিতে বলিলেন এবং ১৪ই ডিসেম্বর নিজে কাজীরখিল গ্রামে তাহার নিজস্ব দপ্তর স্থানান্তরিত করিলেন। এইখানে থাকিয়া মহাত্মাজী নন্দনপুর, করপাড়া, দশঘরিয়া ও মধুপুর গ্রাম পরিদর্শন করেন।

২০শে ডিসেম্বর তিনি সকলকে কাজীরখিলে রাখিয়া মাত্র দুইজন সঙ্গীসহ শ্রীরামপুর গ্রামে চলিয়া আসিলেন। এই শ্রীরামপুর গ্রাম হইতেই মহাত্মাজীর পদব্রজে উপদ্রুত অঞ্চলে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। মহাত্মাজীর শ্রীরামপুরে অবস্থিতির সময়েই শরৎচন্দ্রের সহিত পুনরায় উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শনে উপস্থিত হই। সে কথায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে বাঙলায় ও বিহারে সাম্প্রদায়িক উপদ্রব দমনের ব্যাপারে ভারত গবর্ণমেন্টের শাসননীতির পার্থক্য—প্রথম ক্ষেত্রে নিতান্ত নিষ্ক্রিয়তা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয়তা—এবং তজ্জনিত ক্ষোভের কথা একটু বলিয়া লইব।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

বাঙলায় ও বিহারেঃ

বাঙলার দাবদাহ লাগিয়া বিহার প্রদেশে যে অশান্তির বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা জ্বলিয়া উঠিতে না উঠিতেই নির্বাপিত হইয়া আসিয়াছে। গান্ধীজীর আত্মাহুতির সঙ্কল্পে, বড়লাট এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের কংগ্রেস ও লীগ মন্ত্রীদের দ্রুত হস্তক্ষেপে তথা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের ক্ষিপ্রকারিতায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। সপ্তাহকালের মধ্যে বড়লাট দুইবার পাটনায় ছুটিয়াছেন—একবার স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে এবং আর একবার। অন্যতম লীগ মন্ত্রী সর্দার নিস্তারের সহিত; কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিয়া জনতার সম্মুখীন হইয়াছেন, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং বিমান হইতে বোমাবর্ষণের দ্বারা উপদ্রবকারীদিগকে নির্মূল করা হইবে বলিয়া সতর্ক করিয়াছেন; একবার সর্দার নিস্তারের সহিত এবং পুনরায় জেনারেল বুসারের সহিত বিমান হইতে তিনি উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছেন, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং আচার্য্য কৃপালনী বিহারে উপস্থিত হইয়া উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করিতেছেন, সেনাবাহিনী গ্রামাঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহারা যতদূর সম্ভব কঠোরভাবে উত্তেজনা দমন করিতেছে—একটি গ্রামেই একশতজন তাহাদের গুলিতে নিহত হইয়াছে এবং ইহারই অনুপাতে আহত হইয়াছে।

উপদ্রবের তুলনাঃ

এইভাবে অষ্টবজ্রসম্মেলন করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনের কর্ণধারগণ বাঙলা হইতে বিহারে প্রসারিত অশান্তির অগ্নিশিখাকে যে সদ্য সদ্য নিরুদ্ধ ও নির্বাপিত করিয়াছেন তজ্জন্ত তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষের ধন্যবাদভাজন। বাঙলাদেশে আমরা—যাহারা গত ১৬ই আগষ্ট হইতে অরাজকতা ও শান্তির সমবেত দাবদাহে অহর্নিশ দগ্ধ হইতেছি—নেতৃবৃন্দের এই চেষ্টার গুরুত্ব ও সাফল্য বিশেষভাবেই উপলব্ধি করি। তবু বিহারের উপদ্রবকারীরা লোকের ধর্মনাশ করে নাই— নারীর সতীত্বনাশ করে নাই—স্ত্রীর চক্ষের উপর স্বামীকে হত্যা করিয়া স্বামিহন্তার সহিত তাহার বিবাহের অভিনয় করিয়া পৈশাচিক প্রবৃত্তির পরিচয় দেয় নাই। বিহারে যাহা ঘটিয়াছে—তাহা হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহদাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাঙলা দেশে আমরা মাত্র এই দণ্ড দিয়াই যদি অব্যাহতি পাইতাম তাহা হইলেও আজ অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু আমাদিগকে যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে রাষ্ট্রপতি কৃপালনীর ভাষায় তাহা হত্যা অপেক্ষাও ভয়াবহ। বিহারে যারা উৎপীড়িত ও উপদ্রুত তাহাদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপনের সঙ্গে এই সান্ত্বনা অনুভব করিতেছি যে তাহাদিগকে অসহায়ভাবে জননী, ভগিনী ও কন্যার চরম লাঞ্ছনা চক্ষের উপর দেখিতে হয় নাই—বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হওয়ার যে গ্লানি মনুষ্যত্বের সেই চরম গ্লানি তাহাদিগকে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিহারের উপদ্রুত অঞ্চল দেখিয়া পণ্ডিত জওহরলাল বলিতেছেন— "ইহা ভয়াবহ।" পণ্ডিতজীর কথা অস্বীকার করিব না, শুধু এইটুকু নিবেদন করিয়া রাখিব—১৬ই আগষ্ট হইতে তিন দিন ধরিয়া কলিকাতার গৃহে ও রাজপথে যে ভয়াবহতা দেখা দিয়াছিল তাহা তিনি দেখেন নাই, ১০ই অক্টোবর হইতে নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় যে ভয়াবহতার অবাধ প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল তাহা তিনি দেখেন নাই। কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিভীষিকাময়ী সেই তিন রাত্রির ভয়াবহতা আমরা দেখিয়াছি— দেখিয়াছি কৃষ্ণা রজনীর নিবিড় অন্ধকারের পটভূমিকায় রাজধানীর বুকের উপর প্রজ্বলিত শ্মশানবহ্নি

দিঙ্মণ্ডল রাঙ্গাইয়া তুলিতেছে,—দেখিয়াছি প্রচণ্ড আক্রমণ-ধ্বনির আতঙ্কে নিশীথশয্যায় নিদ্রিত শিশুর দল বারবার শিহরিয়া কঁদিয়া উঠিতেছে; কলিকাতার সেই শ্মশানবহ্নির শিখা আজ বিহারকে স্পর্শ করিয়াছে—বাঙলার পূর্বপ্রান্তে নোয়াখালিতে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের যে বিশাল চিতা রচনা করা হইয়াছিল সেই প্রজ্বলিত চিতাবহ্নির প্রতিচ্ছায়া, পশ্চিম দিগন্তকে রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে—পণ্ডিতজী ভয়াবহতার প্রতিরূপ দেখিয়াছেন, উহার স্বরূপ দেখিবার দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে আমাদেরই।

শাসনের পার্থক্যঃ

কলিকাতায় "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" উপলক্ষ্য করিয়া যখন বিভীষিকার অকস্মাৎ প্রাদুর্ভাব, তৎকালে প্রাদেশিক শাসনের চরম ব্যর্থতা প্রকট। শাসন কর্তৃপক্ষ হয় নিষ্ক্রিয়—নয় উদাসীন—নয় অক্ষম। যে কারণেই হউক, তাহারা গুণ্ডাশাহীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন আর তাহারই সুযোগে রাজধানীর বুকের উপর লুন্ঠন, হত্যা ও নারীহরণের অবাধ তাণ্ডব চলিয়াছে! তিন দিনের শোণিতোৎসবে অন্যূন পাঁচ সহস্র লোক সদ্য প্রাণ দিয়াছে এবং আরও অন্যূন পঞ্চদশ সহস্র আহত হইয়াছে ; স্মরণীয় কালের মধ্যে রাজশাসনের এত বড় ব্যর্থতা দেখা যায় নাই। তথাপি এই বিভীষিকা প্রকাশ্যে ঘটা সত্ত্বেও এবং প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী মহাশয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ শুনিয়াও কোথা হইতে কেহ মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয় নাই। তৎকালে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদে প্রবেশ করেন নাই [কংগ্রেস নেতৃগণ কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদের কার্যভার গ্রহণ করেন ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬। মুসলীম লীগ তখনও যোগ দিতে অসম্মত। লীগের সহিত লর্ড ওয়াভেলের ও কংগ্রেসপক্ষের মীমাংসার পর শাসনপরিষদের লীগসদস্যগণের নাম বিজ্ঞাপিত হয় ১৫ই অক্টোবর এবং ইহার পর সপ্তাহকালের মধ্যে তাহারা কার্যভার গ্রহণ করেন।] —বড়লাট লর্ড ওয়াভেল একাই সর্বময় প্রভু। মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অনুষ্ঠিত কলিকাতার সেই নাদিরশাহী লুন্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চক্ষের উপর দেখিয়া তাহার অব্যবহিত পরেই ২৫শে আগষ্ট তিনি কেন্দ্রীয় শাসনপরিষদে যোগ দানের জন্য লীগকে আহ্বান করিলেন এবং বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডল অপসারণের সকল অনুরোধ অগ্রাহ করিয়া লীগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন : "My new Government will not have any power or indeed any desire to trespass on the field of provincial administration" অর্থাৎ— "আমি যে নূতন গবর্ণমেন্ট গঠন করিব, প্রাদেশিক শাসনে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা বা অভিপ্রায় তাহার থাকিবে না।"

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কাণ্ডের দ্বারা লীগদল এই পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র পাইবার পর নোয়াখালি। বীভৎস অত্যাচারে ও বিভীষিকা সঞ্চারে তাহা কলিকাতার মহা-হত্যাকাণ্ডকেও হার মানাইয়া দিল। তখন কংগ্রেস শাসনপরিষদে যোগ দিয়াছেন কিন্তু লীগ দেন নাই; লীগের শুভাগমনের জন্য ক্ষেত্ররচনায় লর্ড ওয়াভেল অতিমাত্রায় ব্যস্ত। নোয়াখালির উৎপীড়িত মানবতার আর্তনাদ দিল্লীর প্রাসাদদ্বারে আছাড় খাইয়া পড়িল, কিন্তু সে পাষাণপুরীতে কোনো স্পন্দন দেখা দিল না। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল দ্রুত নোয়াখালি অভিমুখে ছুটিলেন না, বা তাঁহার মন্ত্রীদেরও যাইবার জন্য উৎসাহিত করিলেন না, বিজ্ঞের পরামর্শ দিয়া বলিলেন—"জিন্নার সহিত মিটাইয়া লও।"

কংগ্রেস পরিচালনায় যাহার নিঃশব্দ কঠোর শাসন বারবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই সর্দার বল্লভভাই পর্য্যন্ত নোয়াখালির সমস্ত ঘটনা শুনিয়া ১৩ই অক্টোবর দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় সংবাদপত্র-সম্পাদক-সম্মেলনের সভায় বলিলেন— "The Centre had no desire to interfere with the Provinces and they all wanted the Provinces to have the widest possible discretion in all matters."
"প্রদেশের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার কোন ইচ্ছা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের নাই। তাহারা সকলেই চাহেন প্রদেশসমূহের সকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব স্বেচ্ছানুযায়ী চলিবার ক্ষমতা থাকিবে।"

বিহারে অশান্তি ঘটিবার পূর্ব পর্যন্ত ইহাই দেখিয়াছি। কলিকাতার ঘটনার পর এবং পুনরায় নোয়াখালির ঘটনার পর বাঙলার শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও বড়লাট ও তাহার মন্ত্রিমণ্ডল নিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় থাকার নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু বিহারের ঘটনায় তাহাদের নীতি অকস্মাৎ আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে—অকস্মাৎ বড়লাট ও তাহার মন্ত্রিপরিষৎ সমানভাবে সচল ও সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। প্রদেশের শাসনে হস্তক্ষেপ না করিবার অভিপ্রায় প্রদেশের সকল বিষয়ে যতদূর সম্ভব স্বেচ্ছানুযায়ী চলিবার অধিকার সমস্ত পরিবর্তিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল বিহারে পদার্পণ করিয়া একেবারে সরাসরি বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলন দমনের জন্য তৎকালীন ভারত গভর্ণমেন্ট যে চরম দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন আজ বিহারের সাম্প্রদায়িক অশান্তি দমনের জন্য বর্তমান ভারত গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রী পুনঃ পুনঃ সেই দণ্ডই উদ্যত করিতেছেন—বড়লাট বারবার ছুটিয়া আসিতেছেন।

বাঙলার প্রশ্নঃ

প্রদেশের অশান্তি নিবারণের জন্য মন্ত্রিমণ্ডল সহ বড়লাটের এই শক্তি প্রয়োগ দেখিয়া সমগ্র বাঙলা দেশের মর্মস্থল মথিত করিয়া এক প্রশ্ন উঠিতেছে—প্রাদেশিক অশান্তি দমনে বড়লাট ও তাহার মন্ত্রীদের যখন এত ক্ষমতা ও এমন অধিকার রহিয়াছে তখন বাঙলা দেশে তাহা প্রয়োগ করা হইল না কেন? কলিকাতায় “প্রত্যক্ষ সংগ্রামের” তাণ্ডবের সময় এবং নোয়াখালির পৈশাচিক অত্যাচারের সময় কেন বড়লাট ও তাহার মন্ত্রীরা সদ্য সদ্য ছুটিয়া আসিলেন না? কেন বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা দুর্বৃত্তগণকে নিবৃত্ত করিলেন না? গ্রামবিশেষেই একশত লোককে নিহত ও বহুলোককে আহত করিয়া তাহার বিহারকে যেভাবে সায়েস্তা করিতেছেন, বাঙলায় প্রথম দিকে উদ্যোগী হইলে এতটা করিবারও হয়তো প্রয়োজন হইত না—উদ্যত ও দৃঢ় হস্তে দণ্ড প্রয়োগের সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেই চলিত—বহু নারীর চরম লাঞ্ছনা নিবারিত হইত, বহু লোক ধর্মনাশের চিরন্তন গ্লানি হইতে রক্ষা পাইত। বাঙলায় মুসলিম লীগের “প্রত্যক্ষ সংগ্রাম” হইতে উদ্ভূত বহ্নিদাহকে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা প্রয়োগে সময় থাকিতে নিবারণ করিলে বিহারে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটিত না—বিহার লইয়া তাহাদিগকে বিব্রত হইতে হইত না—পণ্ডিত জওহরলালকে বিমান হইতে বোমাবর্ষণের ভীতি প্রদর্শন করিতে হইত না—মহাত্মাজীকে প্রায়োপবেশনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে হইত না।

বিহারের অশান্তি থামিয়াছে—বাঙলার গৃহদাহও একদিন থামিবে। কিন্তু বাঙলার বুক হইতে এই যে প্রশ্ন গুমরিয়া উঠিতেছে, এই প্রশ্ন থাকিয়া যাইবে এবং একদিন না একদিন বর্তমান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টকে ইহার সম্মুখীন হইতে হইবে। বড়লাট লর্ড ওয়াভেল কি জবাব দিবেন জানি না; কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের সমবেত মন্ত্রিমণ্ডলকে বাঙলার নিকট এই প্রশ্নের জবাবদিহি করিতেই হইবে—এই সঙ্কটের সময়ে তাঁহারা কেন এমন নীতি অবলম্বন করিলেন, যাহা প্রদেশে প্রদেশে এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পৃথক রূপ পরিগ্রহণ করে?

(৯/১১/৪৬)

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

ভুলিবার নহেঃ

নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অংশবিশেষে উপদ্রবের অব্যবহিত পরে গত ১৯শে অক্টোবর বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসরী কমিটির প্রতিনিধিরূপে যখন অবস্থা পরিদর্শনে গিয়াছিলাম, সভ্যতার শ্মশানবহ্নি তখনও সমানভাবে জ্বলিতেছে। একমাস পরে পুনরায় গিয়া দেখিলাম শ্মশানবহ্নি নিভিয়াছে বটে, কিন্তু পরিব্যাপ্ত চিতার অঙ্গারে ও অস্থিতে জনপদের পর জনপদ পরিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রথমবারের পরিদর্শনের সময় দূর হইতে যাহা দেখিয়াছিলাম, এবারে তাহার পরিণাম নিকট হইতে দেখিলাম, পূর্বে যাহা অনুমানে বুঝিয়া লইতে হইয়াছিল, এবারে তাহা প্রত্যক্ষে উপলব্ধি করিলাম। প্রথমবারে দূর হইতে সাধারণভাবে দেখিয়া যে ধারণা মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, এবারে সম্মুখে ও প্রত্যক্ষ সবিশেষ দেখিয়া সেই ধারণাই বহুগুণ দৃঢ়তারসহিত স্থিরীকৃত হইল,–

"It is a misnomer to characterise these happenings merely as 'lawlessness' or 'communal disturbance'. They are nothing short of a total war upon the minority community waged in the name of a political organisation with the ministry under its control and with the officialdom either in collusion or as a conniving party."

নোয়াখালি জেলার লোকসংখ্যার যাহারা কিঞ্চিদধিক এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র, সেই ক্ষীণসংখ্যক হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে ইহা এক সর্বগ্রাসী সংগ্রাম। উপদ্রুত অঞ্চলের হিন্দু সমাজ সর্বাংশে ও সর্বপ্রকারে বিধ্বস্ত হইয়াছে— সমাজে, ধর্ম্মে, সম্পদে ও প্রতিষ্ঠায়; হিন্দু-অধ্যুষিত সমস্ত গ্রাম এবং অন্যান্য গ্রামের হিন্দু-অধ্যুষিত সমস্ত অংশ উপদ্রুত ও বিধ্বস্ত।

বর্ণনাতীত ধ্বংসকার্যঃ

সাশ্রুনয়নে এই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসের দৃশ্যসমূহ দেখিতে দেখিতে কেবলি ভাবিয়াছি আর আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়াছি—এই যাহা ঘটিয়াছে, ইহার কতটুকু আমরা বর্ণনা করিতে বা প্রকাশ করিতে পারিলাম? সংবাদপত্রের সীমাবদ্ধ পরিসরে, সংবাদপত্রের সুনির্দিষ্ট প্রকাশরীতিতে ইহার কতটুকু প্রকাশ করা সম্ভব? গ্রামের পর গ্রাম, গৃহের পর গৃহ দগ্ধ, ভগ্ন ও ধ্বংসস্তূপে পরিণত, অগণিত জনমণ্ডলীর এই অসহনীয় ক্লেশ, ইহাকে ভাষায় রূপ দিতে হইলে যে বাগবিভূতি প্রয়োজন তাহা কোথায়? তাহা কাহারই বা আছে? কেহ যদি সিনেমার বর্ণবহুল ছবি তুলিবার ক্যামেরা লইয়া গিয়া ফটো তুলিয়া আনিত, তাহা হইলে হয়তো কিছু প্রকাশ করা যাইত। মাত্র ভাষায় তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশিত হইবার নহে। ঘটনার প্রথম হইতেই শাসনকর্তৃপক্ষের মুখে শুনিতেছিলাম, সংবাদপত্রসমূহ অতিরঞ্জন করিয়াছে। কিন্তু ঘটনার একমাস পরেও যে ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে তাহা দেখিয়া বুঝিলাম অতিরঞ্জন করা দূরে থাকুক, সংবাদপত্রসমূহ ইহার কিছুই বুঝাইয়া উঠিতে পারে নাই। যেটুকু পারিত বাঙলা গবর্ণমেন্টের নিষেধাজ্ঞায় তাহা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। নন্দনপুরের ধ্বংস, দালালবাজারের ধ্বংস, চণ্ডীপুরের ধ্বংস, হাইমচরের নমঃশূদ্র সমাজের বিরাট ধ্বংস বুঝাইতে হইলে 'আনন্দ মঠের' রচয়িতার পুনরাবির্ভাব প্রয়োজন।

এই বিরাট ও ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ডকে লঘু প্রতিপন্ন করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। ঘটনার প্রথম হইতে গবর্ণমেন্টের মুখপাত্রগণ ইহাই করিয়া আসিতেছেন। মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া গবর্ণর পর্যন্ত সকলের এই এক চেষ্টা—উপদ্রবের বাস্তবতাই সকলে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেল মুখ খুলিয়া কিছু বলেন নাই। কিন্তু তিনিও যে নোয়াখালির উপদ্রবের ভীষণতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহার আচরণ হইতে পাই নাই। এমন কি, গত ১৯শে নভেম্বর তারিখে স্বয়ং নোয়াখালির অধিবাসী বাঙলার মন্ত্রী মৌলবী গফরাণ মহাশয়ের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও অস্বীকৃতির এই অপচেষ্টা সমানভাবে পরিস্ফুট।

ধ্বংসকাণ্ডের বিচারঃ

এই ধ্বংসের পরিমাণ ও প্রকৃতি বিচার করিবার সময়ে কয়েকটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। পূর্বেই বলিয়াছি উপদ্রুত ও বিধ্বস্ত জনসমাজ সমগ্র জেলার জনসংখ্যার কিঞ্চিদধিক এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র। নোয়াখালির জনসংখ্যার মধ্যে ১৮ লক্ষ মুসলমান, মাত্র ৪ লক্ষ হিন্দু; জেলার যে অংশ উপদ্রুত সেই চারিটি থানার লোকসংখ্যায় মুসলমান ৭,৮১,১৪৫ এবং হিন্দু ১,৬৮,১১৪, অর্থাৎ হিন্দুরা জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। সুতরাং ধ্বংসের পরিমাণ ও ব্যাপকতা বিচার করিতে গিয়া যাহারা সমগ্র অঞ্চলের দিকে চাহিয়া বিচার করিবেন, তাহাদের বিচারে ভুল হইবে। সহসা দেখিয়া কেহ যদি বলে অধিকাংশ অঞ্চলই অক্ষত আছে, তাহা সত্য; কারণ, লোকসংখ্যায় যাহারা অধিকাংশ তাহারা উপদ্রুত নহে। মাইনরিটি সম্প্রদায় হিসাবে যাহারা উপদ্রুত, কেবল সেই হিন্দুসমাজের অবস্থার দিকে চাহিয়াই বিচার করিতে হইবে এবং তাহাতেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইবে কি মারাত্মক সংহারের প্রয়াস লইয়া আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় স্মরণ রাখিবার বিষয়, বিমান হইতে দেখিয়া অবস্থার যেটুকু উপলব্ধি হয়, প্রকৃত অবস্থার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। বিমান হইতে দেখিবার সময় অত্যন্ত উর্বর ভূমিতে ঘনসন্নিবিষ্ট বনরাজীর অবরোধ ধ্বংসস্তূপকে দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া রাখে; বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত বলিয়াও সর্বস্থলের ধ্বংসের ব্যাপকতা উপলব্ধি হয় না। প্রথম পরিদর্শনের সময়ে বিমান হইতেও যে ধ্বংসক্রিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহার কারণ তখনও সদ্য-প্রজ্বলিত বহ্নির লেলিহান শিখা চতুষ্পার্শ্বস্থ আবেষ্টন অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল, সদ্য-সমাপ্ত গৃহদাহের ধূমকুণ্ডলী তখনও তরুশীর্ষে পুঞ্জীভূত হইয়া আকাশপথে দেখা যাইতেছিল। ইহা ছাড়া উপদ্রবের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। যে প্রধান রাজপথ উপদ্রুত অঞ্চলকে বেষ্টন করিয়া চৌমুহনী হইতে লক্ষ্মীপুরের দিকে গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে ঠিক সংলগ্ন অংশে উপদ্রবের চিহ্ন পরিস্ফুট নহে। প্রশস্ত রাজপথ বহুস্থলে খণ্ডিত, ভগ্ন ও দুর্গম ; রাজপথের উপর উপদ্রবের চিহ্ন ইহাই মাত্র প্রত্যক্ষ ; কিন্তু গৃহদাহাদি লক্ষ্য করিতে হইলে পথের সংলগ্ন অংশ ছাড়িয়া অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ ও লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহা পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থার ফল কিনা জানি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই ব্যবস্থার ফলে প্রথম দিকের পরিদর্শকেরা এবং মিলিটারী পর্যন্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে। বাহির হইতে যাহারাই গিয়াছে স্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে এই পথ দিয়া ঘুরাইয়া অক্লেশেই বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন যে, কোথাও কিছু হয় নাই, হিন্দু সংবাদপত্রসমূহ অনর্থক অতিরঞ্জিত প্রোপাগাণ্ডা করিতেছে মাত্র। শুনিতে পাই, ব্রিগেডিয়ার থাপারের পর্যন্ত প্রথম দিকে এইরূপ বিভ্রম ঘটিয়াছিল।

অতিরঞ্জন!

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি সংবাদপত্রসমূহ অতিরঞ্জিত করে নাই। যাহা ঘটিয়াছে সংবাদপত্রসমূহ সে ভীষণতার সামান্যই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রথম যাহারা সংবাদ দিয়াছিল তাহাদের অত্যুক্তি ঘটিয়াছিল মাত্র একটা বিষয়ে—মৃত্যুসংখ্যায়। অন্যান্য অপরাধ ও অপরাধের পাশবিকতার সংবাদে তাহাদের বর্ণনা বাস্তবের বহু নিম্নে রহিয়া গিয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা নির্ধারণে যে আধিক্য ঘটিয়াছে, তাহাও তাহাদের ইচ্ছাকৃত নহে। তৎকালীন অবস্থাবশতঃ অপরিহার্যভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। যে যে অবস্থায় একদিকে অবাধ, অবিচারিত ও নির্মম হত্যার অভিযান চলিয়াছে এবং অপরদিকে ক্রমাগত দুই তিন দিন বা তাহারও অধিককাল ধরিয়া সমগ্র হিন্দুপল্লীর অধিবাসী শৈবালপ্রচ্ছন্ন জলের মধ্যে, নিবিড় ও দীর্ঘ প্রসারিত ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে, কন্টকাকীর্ণ বেতসজঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে; লোকবসতি শূন্য হইয়া গিয়াছে; পরিবার বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে; সেই অবস্থায় জনশূন্য পল্লীর সকল লোককেই কেহ যদি মৃত অনুমান করিয়া সংবাদ দিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে? বরং সেই অবস্থায় তাহাই স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পাকিস্থানী অভিযানে যাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাদের কর্মপদ্ধতির প্রথম করণীয়ই ছিল হত্যা, হত্যার পর যাহারা রহিল তাহাদের ধর্মান্তর, নারীহরণ, লুণ্ঠন ও গৃহদাহ। সুতরাং হত্যার পরিমাণ যে আরও অধিক হয় নাই তাহা কাহারও অনুগ্রহে নহে—নিতান্তই ঘটনাচক্রে। প্রথম সংবাদ দাতাদের সংবাদে যেমন মৃত্যুসংখ্যার অত্যুক্তি ঘটিয়াছিল তেমনি সরকারী সংবাদে উহাকে লঘু করিবার চেষ্টাও অতিমাত্রায় প্রকট যদিও সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী প্রথমে ১০০ পর্য্যন্তও উঠিতে সম্মত হন নাই—রামগঞ্জে তাহার সর্বশেষ বক্তৃতায় ২০০ পর্যন্ত উঠিয়াছেন; কাউন্সিল অব ষ্টেটের বিবৃতিতে ভারত গবর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের অন্যতম লীগসদস্য সর্দার আবদুর রব নিস্তার উঠিয়াছেন ৩০০ পর্যন্ত। দেখা যাইতেছে, মৃত্যুসংখ্যা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টও নিশ্চিত নহেন। করপাড়ার রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল চৌধুরীর গৃহের ও অন্যান্য মৃত্যুসংখ্যা প্রথমে শোনা গিয়াছিল ২১, তাহার পরে হইল ২৬, আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন পর্যন্ত মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৪। যাহা শুনিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই একটি স্থানের মৃত্যুসংখ্যাই আরও অধিক বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যাহারা উৎখাত হইয়া দূরে গিয়া অভাবে ও ব্যাধিতে মরিয়াছে তাহাদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যাহারা স্বস্থানে থাকিয়া বা উহার বাহিরে নীত হইয়া নিহত হইয়াছে তাহাদের কথাই ভাবিতেছি। তাহাদের সঠিক সংখ্যা কেহ নির্ধারণ করিতে পারিবে কি? কখনও নির্ধারণ সম্ভব হইবে কি?

[বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তৎকালীন সভাপতি শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষের যে বিবৃতি ১৮ই অক্টোবর প্রকাশিত হয়, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন নিহতের সংখ্যা ৫ হাজার। এখানে অত্যুক্তি ঘটিয়াছে সত্য। কিন্তু নিহতের সংখ্যা এইরূপ অতিপ্রভূত না হইলেও উহা যে প্রভূত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিরূপ পাইকারী হারে হত্যা করা হইয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিলেই অবস্থা উপলব্ধি হইবে। করপাড়ায় নিহতগণের মধ্যে একমাত্র রায় চৌধুরীদিগের গৃহে যাঁহারা নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যাই ২৭। গোপাইরবাগ গ্রামের দাস পরিবারের ২২জন পুরুষের মধ্যে ৯ জন নিহত হয় ; ৩ জন কোনক্রমে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। তৎকালীন পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাগিনেয় আবুল কাসেম নামে এক ব্যক্তি এই হত্যাকার্য্য করে। গোবিন্দপুরে (বড় গোবিন্দপুর) রায় ও ভৌমিক পরিবারের হত্যাকাণ্ডও এই প্রকার। এই হত্যাকাণ্ডে মোট ২৭ জন নিহত হয়। গোমাতলী গ্রাম হইতে পুলিশ প্রহরাধীন দত্তপাড়ার আশ্রয়কেন্দ্রে আসিবার পথে প্রায় শতাধিক আশ্রয়প্রার্থী নরনারী আক্রান্ত হয়। অন্ততঃ ১৯ জন সদ্য সদ্য নিহত হয়। যাহারা আহত হইয়া প্রাণে বাঁচিয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন তৎকালে মুমূর্ষু হইয়াছিল।

এইরূপ পাইকারী হত্যা ছাড়া আরও হত্যা হইয়াছে বহু। অনেকগুলির বিবরণও আছে, সব দিবার স্থান নাই। তাহা ছাড়া, পলায়নের পথে নৌকায় যাহারা নিহত ও জলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং যাহাদের মৃতদেহ হত্যাকারিগণ কর্তৃক অপসারিত হওয়ার ফলে বিবরণ পাওয়া যায় নাই এরূপ ঘটনাও অনেক। পরিবারের পুরুষদিগকে হত্যা এবং নারীদিগকে হরণ,- ইহাই আক্রমণকারীদের লক্ষ্য ছিল।

পরিবারের বাস ও গ্রাম বিধ্বস্ত, বহু পরিবার লুপ্ত এবং বহু পরিবার উৎসন্ন হওয়ার ফলে সঠিক বিবরণ পাইবার সম্ভাবনা নষ্ট হইয়াছে। পুলিশ অফিসারেরাও অপরাধের হিসাব রাখিবার কোন আগ্রহ দেখান নাই। সদ্য সদ্য যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল তাহাই মাত্র রহিয়া গিয়াছে। সমস্ত বিবেচনা করিয়া মনে হয় বাঙলার গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজের রিপোর্টের প্রতিবাদে শরৎচন্দ্র স্বীয় বিবৃতিতে যাহা বলিয়াছিলেন সংখ্যা সেইরূপই হইবে; অর্থাৎ ৫ সহস্র না হউক, উহা যে সহস্রের কোঠায় থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহ। হত্যার কার্য্যে যে সকল বীভৎসতা অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা উল্লেখ করিলাম না।]

ঐতিহাসিক ঘটনাঃ

নোয়াখালি-প্রসঙ্গের একদিকে কলিকাতা ও অপরদিকে বিহার ধ্বংসের ব্যাপকতায় নোয়াখালির ঘটনা কলিকাতাকে বহুদূর অতিক্রম করে। বস্তুতঃ নোয়াখালি-ত্রিপুরায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা আকস্মিক উপদ্রবমাত্র নহে, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনার পর্য্যায়ভুক্ত। এই বর্বর ভীষণতার স্মৃতিচিহ্ন অপসারিত হইতে ৫০ বৎসর যাইবে এবং স্মৃতি অবলুপ্ত হইতে লাগিবে অনূন্য এক শতাব্দী। মুর্শিদ কুলি খাঁ বা কালাপাহাড়কে ইতিহাস এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। নোয়াখালির উপদ্রবও তেমনিভাবে ইতিহাসে স্থানলাভ করিবে। রাষ্ট্রশাসন এক অধিকার হইতে অন্য অধিকারে যাইবার সময় অরাজকতা দেখা দিলে যাহা ঘটে—শ্রেণী বা সমাজকে যেভাবে উপদ্রুত ও বিধ্বস্ত হইতে হয়-ভারতের ইতিহাসে একাধিকবার রাষ্ট্রবিপর্যয়ের সময়ে যাহা ঘটিয়াছে, নোয়াখালির ঘটনা সেই ঐতিহাসিক পর্যায়ে স্থান পাইবে—ইতিহাসের সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ইহার বিচার করিতে হইবে। নোয়াখালির ঘটনার এই ঐতিহাসিকতার সহিত তুলনায় বিহারের ঘটনা প্রতিক্রিয়াসঞ্জাত আকস্মিক ব্যাপার মাত্র।

নোয়াখালির ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহিরে আসিয়া মনে হইতেছে এক দারুণ দুঃস্বপ্নের আবেষ্টন হইতে মুক্তি পাইয়াছি—একটা প্রচণ্ড বিভীষিকা যেন চতুষ্পার্শ্ব হইতে সরিয়া গিয়াছে। ভীষণতার ও নির্মমতার সেই নিদর্শনসমূহ দূর হইতে এখন যেন কল্পনার বস্তু বলিয়া বোধ হইতেছে। যে উপদ্রুত সমাজকে নিত্য ও সর্বক্ষণ ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে ও ইহারই মধ্যে যাহাদের বাস করিতে হইতেছে, আপনার মনের দিকে চাহিয়াই তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। পরিদর্শনকালে আমাদের সাথী আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীগণকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি—যুদ্ধের মারণাস্ত্রসমূহও এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংস ঘটাইতে পারে না। যুদ্ধের ধ্বংস দেখি নাই। কিন্তু নোয়াখালিতে ও ত্রিপুরাতে যাহা দেখিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে-ভুলিবার নহে—ভুলিবার নহে! (১১.১২.৪৬)

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

উৎখাত পরিবারের জীবন-সমস্যাঃ

ধ্বংস্তূপের পর নোয়াখালিপ্রসঙ্গের দ্বিতীয় বেদনাদায়ক স্মৃতি উৎখাতদিগের দুর্বহ জীবন-সমস্যা। স্ব স্ব গৃহ ও গ্রাম হইতে উৎসন্ন হইয়া যে অগণিত নরনারী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহাদের রক্ষা করিবার কি হইবে? রিলিফ কেন্দ্রে যাহারা একটু মাথা খুঁজিবার ঠাঁই পাইয়াছে, তাহাদের জীবন রক্ষার তবু কিছু ভরসা আছে। কিন্তু যাহাদের তাহা জোটে নাই, যাহারা শূন্যস্থানে, রেলষ্টেশনে এবং তাহাতেও স্থান না পাইয়া উন্মুক্ত নদীবক্ষে নৌকায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের ভরসা কি? বিশেষতঃ এই শীতকালে? নিম্নে সিক্তভূমি, উপরে মুক্ত আকাশ এবং চতুর্দিকে অবাধ হিমতীক্ষ্ণ বায়ু—এই অবস্থার মধ্যে মানুষ এমনিই বাঁচে না; যাহারা কিছুকাল পূর্বেও সম্পন্ন গৃহস্থের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল, তাহারা অকস্মাৎ উৎখাত হইয়া শিশুবৃদ্ধস্ত্রীলোকসহ যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছে, তাহার চিন্তাও দুঃসহ। সম্পন্ন অবস্থা হইতে যাহারা সহসা পথে বসিয়াছে তাহারা ছাড়া আরও অনেকের পক্ষেই যে জীবনরক্ষা করা সম্ভব হইবে না তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছেঃ

সুতরাং হয় ধর্ম্মান্তর না হয় মৃত্যু—এই দুই বিকল্প সম্মুখে রাখিয়া অভিযানে বাহির হইয়া যাহারা এতগুলি লোককে উৎখাত করিয়াছে, তাহাদের উদ্দেশ্য প্রকারান্তরে সিদ্ধ হইয়াছে বৈ কি? ধর্ম্মান্তর বা অপঘাতের সম্ভাবনা উৎখাতগণ এড়াইয়াছে বটে; কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনা ইহাদের উপর ছায়া ফেলিয়াছে। রিলিফ কেন্দ্রের আশ্রয়েই হউক বা উন্মুক্ত স্থানেই হউক, যেভাবে ইহাদিগকে জীবন কাটাইতে হইতেছে তাহা শারীরিক বা মানসিক কোনো প্রকার স্বাস্থ্যের পক্ষেই কল্যাণজনক নহে। গৃহ-পরিবেশ হইতে ও সামাজিক জীবন হইতে এইভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া লোকে বহুদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।

নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার রিলিফ ক্যাম্প ছাড়া চাঁদপুর, আখাউড়া, চৌমুহনী প্রভৃতি ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মেও উৎখাত-সমাবেশ লক্ষ্য করিয়াছি। চাঁদপুর ষ্টেশনে উহা উপনিবেশে পরিণত হইয়াছে বলিলেও চলে। কোনো কোনো রিলিফ ক্যাম্পের অবস্থা যাহা দেখিয়াছি এবং সরকারী রিলিফ সম্বন্ধে যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে ষ্টেশন-আশ্রয়ী জনতার কথা আর উঠাইতে ইচ্ছা হয় না। কুমিল্লার কর্মীরা স্থানীয় বিদ্যাভবনসমূহে যে কয়টি রিলিফ ক্যাম্প খুলিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা যথাসাধ্য সুব্যবস্থা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্যজীবন রক্ষার জন্য আরও যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন এবং সে বন্দোবস্ত নির্ভর করে সরকারী সাহায্য, সুব্যবস্থা ও মনোযোগিতার উপর।

আশ্রয়প্রার্থি-নিবাসের অব্যবস্থাঃ

বিভিন্ন উৎখাত-নিবাসের যে সকল সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে দুইটা অভাব ও অব্যবস্থা বিশেষভাবে দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিঃ— ঔষধ-পথ্য ও চিকিৎসকের অভাব এবং প্রসূতি ও সদ্যোজাত

শিশুদের উপযুক্ত রক্ষণব্যবস্থার একান্ত অভাব। একে স্বাস্থ্যরক্ষার অত্যন্ত প্রাথমিক ব্যবস্থারও অভাব, তাহার উপর উপযুক্ত ঔষধের অভাব; সকল উৎখাত-উপনিবেশের ইহা সাধারণ অভিযোগ। রামগঞ্জে যাইতে পথের দুই দিকের রিলিফ ক্যাম্প হইতে যে উৎকট দুর্গন্ধ আসিতেছিল তাহাতেই বুঝিলাম স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার নিতান্তই অভাব। আমিষাপাড়া যাইবার দিন আমাদের পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়; রাত্রিতে ফিরিতে পারি নাই—রিলিফ ক্যাম্পে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। আশ্রয়প্রার্থীদের সহিত একরাত্রি কাটাইয়া দেখিলাম, শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকেই সর্দি-কাসিতে বিশেষ ভুগিতেছে। নিউমোনিয়া এবং ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রিলিফ ক্যাম্পের সাধারণ ব্যাধি, তাহার উপর উদরাময়। ফরিদগঞ্জে হাসপাতাল-নামধেয় একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ৭০০০ আশ্রয়প্রার্থীর জন্য প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালের তত্ত্বাবধান করিতে একটি সদ্য পাশ করা এল-এম-এফ ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেই হাসপাতালের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। উৎখাত ও আশ্রয়প্রার্থিগণ যে, সম্প্রদায়ভুক্ত তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব নাই; তথাপি কেন জানি না গবর্ণমেন্ট বাছিয়া বাছিয়া ভিন্ন সম্প্রদায়ের এই এল-এম-এফ ডাক্তারটির উপরেই এই গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত করিয়াছিলেন। চিকিৎসকমহলের সংবাদে জানিতে পারিয়াছিলাম যে স্থানীয় অবস্থা এমনই যে, এপেন্ডিক্স-শূলবেদনায় আক্রান্ত একটি রোগীর জন্য একটি মরফিন ইনজেকসন সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই।

আসন্নপ্রসবা ও সদ্যপ্রসূত নারীঃ

নোয়াখালি হইতে এই সমাজগত উচ্ছেদে আসন্নপ্রসবা নারীরা যে ক্লেশ পাইয়াছে, সে মর্ম্মবিদারী কাহিনী কখনও প্রকাশিত হইবে না। রেলগাড়ীর কামরায়—রেল-ষ্টেশনের প্লাটফর্মে প্রসববেদনায় কাতর ও সদ্যপ্রসূতা নারীদের অবস্থার কল্পনাই যথেষ্ট। আশ্রয়প্রার্থি-নিবাসের ভূমিশয্যায় থাকিয়াও ঔষধপথ্যের অভাবে সদ্যোজাত শিশুদের জীবন গিয়াছে এবং যখন এই সংবাদ পাইয়াছি তৎকালীন অবস্থায় সদ্যপ্রসূতা জননীরা মৃত্যুর পথে আগাইতেছেন। ২১শে নভেম্বর তারিখে ফরিদগঞ্জ অঞ্চলের সংবাদে জানিতে পারি, পূর্ববর্তী ১২ দিনের মধ্যে দুইশতাধিক শিশু জন্মিয়াছে—শিশুগুলি সবই মারা গিয়াছে এবং বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে জননীদের বাঁচাইবার সম্ভাবনা অল্পই।

[বাঙলা গভর্ণমেন্টের প্রচারবিভাগ ইহার প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদটি এই :-

“গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশিত ‘নোয়াখালীর ধ্বংসকাণ্ড’ শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন যে, গত ৯ই নভেম্বর হইতে ২১শে নভেম্বরের মধ্যে ফরিদগঞ্জে দুই শতাধিক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং প্রত্যেকটি নবজাত শিশুই মারা গিয়াছে। এ ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করা হইয়াছে। চাঁদপুর ক্যাম্প হইতে জনস্বাস্থ্য বিভাগের স্পেশাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট ডিরেক্টর জানাইয়াছেন যে, প্রবন্ধে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ফরিদগঞ্জ এলাকায় মাত্র ১৮টি শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র দুইটি শিশু ও একজন প্রসূতি মারা গিয়াছে।

ইতি বশম্বদ পি, এস, মাথুর, বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর”

—আনন্দবাজার পত্রিকা, সহর সংস্করণ, ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৪৭।

এই প্রতিবাদ সম্বন্ধে দুইটী বক্তব্য আছে; প্রথম, ফরিদগঞ্জ আশ্রয়প্রার্থি-হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতেই আমার বিবরণ তৎকালে সংগৃহীত এবং দ্বিতীয়, নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ডের আলোচনায় প্রকাশিত বিবরণসমূহের মধ্যে মাত্র এই একটি ক্ষেত্রেই সরকারী প্রতিবাদ পাওয়া গিয়াছে।]

যাহা সাধারণ মানুষেরও খাদ্য হইবার উপযোগী নহে, সদ্যপ্রসূতা জননীদের সেই খাদ্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ভূমি শয্যা, অনাচ্ছন্ন গৃহ, ঔষধপথ্য নাই, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা দূরের কথা, ব্লিচিং

পাউডার পর্যন্ত নাই—তাহার উপর আহারের জন্য "Broken Rice" নাম দিয়া খুদ সরবরাহ-ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা হইতে পারে তাহাই হইয়াছে।

উৎখাত ও আশ্রয়প্রার্থীদিগের এই ক্লেশকর জীবন লক্ষ্য করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, নিতান্ত বিপন্ন না হইলে ইহারা আসে নাই। বহুপুরুষের বাস্তব্য বাসভূমি ও বহুপরিচিত আবেষ্টন ছাড়িয়া ইহারা অকস্মাৎ চলিয়া আসিয়াছে কোন অনিশ্চিত সাহায্যের আশায়। কোথায় যাইবে জানে না—কে সাহায্য করিবে জানে না—আহারের অভাবে ও চিকিৎসার অভাবে মরিবে, তথাপি চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের মত অসহায় সংসারে কেহ আছে কি না সন্দেহ। গবর্ণমেন্টপক্ষীয় ব্যক্তিরা যখন বলেন, ইহারা "প্যানিকে" (আতঙ্কে) চলিয়া আসিয়াছে, তখন তাহা ইহাদের অসহায়তার প্রতি পরিহাস বলিয়াই মনে হয়। এক "প্যানিক" কথাটি চালাইয়া গবর্নমেন্ট দুইটা গুরুতর দায়িত্ব এড়াইতে চাহিতেছেন—যে কারণে ইহারা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে তাহার দায়িত্ব এবং চলিয়া আসিবার পর ইহাদের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বলিয়া ইতিপূর্বে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে উৎখাত ও ও আশ্রয়প্রার্থি-সমস্যা দেখা দেয় নাই। কিন্তু গত ১৬ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় মুসলিম লীগের "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" অনুষ্ঠানের সময় হইতেই এই সমস্যা দেখা দিয়াছে—ইহাই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই একটি বিষয় তলাইয়া দেখিলেই গবর্ণমেন্ট ইহার হেতু ও স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। আসল কথা এবারে লোকে গবর্ণমেন্টের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। উৎখাত ও আশ্রয়প্রার্থী-সমস্যা তাহারই পরিণাম; মাত্র "প্যানিকের" অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেন্টপক্ষীয়গণ ইহা চাপা দিতে পরিবেন না বা আপনাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন না।

রিলিফ বিতরণে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতঃ

বিহার হইতে আনীত সম্প্রদায়বিশেষের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বাঙলা গবর্নমেন্ট যাহা করিতেছেন তাহার সহিত নোয়াখালি-ত্রিপুরার উৎখাত গণের প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার তুলনা করিয়া লজ্জাবোধ করিতেছি। আসানসোল অঞ্চলে আনীত বিহারী আশ্রয়প্রার্থীদের খাদ্যাদির ব্যবস্থা যাহা শুনিতে পাই তাহার সহিত নোয়াখালি-ত্রিপুরার উৎখাতগণের খাদ্যব্যবস্থার তুলনা গ্লানিজনক। বিহারের উৎখাতগণের জন্য বিহার, গবর্ণমেন্ট যে পরিমাণ খাদ্য বরাদ্দ করিয়াছেন, পূর্ব বাঙলার উৎখাতগণের জন্য বাঙলা গবর্ণমেন্টের বরাদ্দ তাহা অপেক্ষাও কম। এই কম বরাদ্দও বাঙলা গবর্ণমেন্টের কর্ম্মনীতি এবং স্থানীয় কর্মচারীদের ব্যবস্থার ফলে উৎখাত গণের নিকট সম্পূর্ণভাবে পৌঁছায় নাই। উৎখাত হইল এক-সম্প্রদায়, কিন্তু গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা হইল অন্য-সম্প্রদায়কেও রিলিফের রেশন দিতে হইবে এবং বাছিয়া বাছিয়া এই অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের কর্মচারীকেই রেশন সরবরাহের কার্যে নিযুক্ত করা হইল। স্থানীয় প্রধান প্রধান শাসনকর্মচারীও নিযুক্ত হইয়াছেন এই একই সম্প্রদায় হইতে আর তাহারাও বাছিয়া বাছিয়া স্বসম্প্রদায়ভুক্ত ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টের মারফতে রেশন বিলির ব্যবস্থা করিলেন এবং উৎখাতগণ যখন সহরের দিকে চলিয়া আসিয়াছে তখন মফস্বলে রিলিফের দ্রব্যাদি বিতরণের নির্দেশ দিলেন। ফলে যাহারা সত্য সত্য উপদ্রুত ও উৎখাত হইল, তাহারা রিলিফ বরাদ্দের একাংশ মাত্র পাইল, অপরাংশ এবং হয়তো বা অধিকাংশই চলিয়া গেল তাহাদেরই হাতে যাহারা উৎখাতগণের গৃহত্যাগের জন্য দায়ী এবং তারা পূর্বেই এক দফা লাভবান হইয়াছে। শেষোক্তগণের মধ্যে রিলিফ বিতরণের যৌক্তিকতাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া শুনিয়াছি, ইহাদের মধ্যে অনেকে উপদ্রবঘটিত অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের পরিবারও অসহায়, সুতরাং সাহায্য পাইবার যোগ্য। জানি না, বাঙলা গবর্ণমেন্ট গোপনে এই নীতি গ্রহণ করিয়াছেন কিনা যে, গুরুতর অপরাধের অভিযোগে যাহাদের গ্রেপ্তার করা হইবে, তাহাদের পরিবার সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি গবর্ণমেন্ট এই নীতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অপরাধ দমনের পক্ষে ইহা যে অত্যন্ত অনুকূল নীতি তাহাতে সন্দেহ কি!!

উৎখাত সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত রিলিফ দ্রব্যাদি অন্য সম্প্রদায়ের নিকট যে চলিয়া যাইতেছে, তাহার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণস্বরূপ স্থানীয় ব্যক্তিরা ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ ও পাইকপাড়া অঞ্চলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। হাইমচরের উৎপীড়িতগণ বিশেষভাবে আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন যে, তাহারা কেরোসিন একদম পাইতেছেন না। কোন বিশিষ্ট সংবাদদাতা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলেন, চাঁদপুর মহকুমায় সরবরাহ করা রিলিফের দুই-তৃতীয়াংশই এইভাবে উৎখাতগণকে না দিয়া অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। বাঙলা গবর্নমেন্ট কর্তৃক সমরবিভাগ হইতে সংগৃহীত প্রায় ১০০০ উৎকৃষ্ট কম্বল চাঁদপুরের মহকুমা হাকিম, “খাঁ মহাশয়” [মৌলবী আফতাব আহম্মদ খাঁ] যেভাবে বিলি করিয়াছেন- তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ উদঘাটিত হইলেই এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানা যাইবে। অপর একজন সংবাদদাতার নিকট শুনিলাম, এই চাঁদপুর মহকুমাতেই কোন কোন আশ্রয়প্রার্থিনিবাসে ভূমিশায়ী উৎখাতগণের জন্য কম্বলের ফরমাইস করা হইলে, সরকার হইতে কম্বল প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হইল যে, মফঃস্বলের জন্যও এই কম্বল দিতে হইবে। উৎখাতগণ তখন মফঃস্বল হইতে সরিয়া আসিয়াছে, যাহারা তাহাদিগকে উৎখাত করিয়াছিল মফঃস্বলে রহিয়াছে তাহারাই। সুতরাং এই নির্দেশের ফলে প্রেরিত ৫০০ কম্বলের মধ্যে ২০০ মফঃস্বল রিলিফের নামে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে চলিয়া গেল—উৎখাতগণের অনেকে যেমন ছিল তেমনি মাটীতেই রহিল।

কেবল মফঃস্বলে পাঠাইয়াই শেষ নাই। চাঁদপুর সহরেরও এক প্রান্তে দেখিলাম, এই অনুগৃহীত সম্প্রদায়ের জন্য এক আশ্রয়প্রার্থিনিবাস খোলা হইয়াছে এবং পাকিস্থানমার্কা টুপী পরিহিত এক ব্যক্তি যষ্টিহস্তে তাহার প্রায়বরুদ্ধ প্রবেশপথে পাহারা দিতেছে। কিছু কিছু লোকও ভিতরে আছে সত্য। কে ইহাদের উপর উপদ্রব করিল, কোথা হইতে ইহারা উৎখাত হইয়া আসিল জানিবার জন্য দ্বারপালটীকে কয়েকবার প্রশ্ন করিলাম—বিশেষ সদুত্তর পাইলাম না; অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতেও ভরসা হইল না। সহরের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এই রিলিফ কেন্দ্রের আশ্রিতগুলি সহর হইতেই সংগৃহীত। যাহারা পূর্ব্বে পথে অন্ন সংগ্রহ করিত, তাহারা এখন ঘরে বসিয়া অন্ন পাইতেছে এবং সহরে আশ্রিত উৎখাতদিগের জন্য বরাদ্দ রিলিফের একটা অংশ এই দিকে যাইতেছে।

উৎখাত-বিতাড়নঃ

একদিকে এই ব্যাপার চলিতেছে—অপরদিকে যাহারা প্রকৃতই আশ্রয়হীন ও উৎখাত, তাহাদিগের উপর গবর্ণমেন্টের হুমকী চলিতেছে, চলিয়া যাও নহে তো রেশন বন্ধ করিয়া দিব। গবর্ণমেন্ট মাত্র এই হুমকী দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ইহা কার্য্যেও পরিণত করিয়াছেন যদিও সে সংবাদ সংবাদপত্রের নিকট পৌছায় নাই। চাঁদপুরের হাসানআলী জুবিলী স্কুলে সরকারী রিলিফ কেন্দ্রে প্রায় ১২০০ উৎখাত ব্যক্তি আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, ইহারা আশ্রয়চ্যুত ও অন্নহীন হইয়াছে, ২০০ লোক বেসরকারী আশ্রয়ে স্থানলাভ করিয়াছে, বাকী সহস্রের পুনরায় নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। চাঁদপুরের গণি হাই ইংলিশ স্কুলে সরকারী রিলিফ কেন্দ্রে প্রায় ৬০০/৭০০ উৎখাত আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধেও একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং তাহারাও এখন নিরুদ্দেশ। হয় মৃত্যু, নয় ধর্মান্তর—এই যে দুই বিকল্পের সম্মুখীন হইয়া ইহারা ভিটামাটির মায়া কাটাইয়া চলিয়া আসিয়াছিল, আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতিকারের দ্বারা সেই বিকল্পসম্ভাবনা দূর করিতে সরকারী কর্মচারীদের যোগ্যতা ও উৎসাহের যথেষ্ট পরিচয় নাই। অথচ এই বিকল্প-সম্ভাবনা বর্তমান থাকিতে ইহাদের পূর্বস্থানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করার পরিণাম কি তাহাও দুর্বোধ্য নহে।

বেসরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজনঃ

সরকারী ব্যবস্থা যাহাই হউক, বেসরকারী ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখিতেই হইবে। যে সকল স্থানে আশ্রয়প্রার্থী-সমাবেশ হইয়াছে, তথায় আহার্যের সরবরাহ স্থানীয় বন্দোবস্তের দ্বারাই হইবে কিন্তু বাহির হইতে ঔষধপথ্যাদির যথেষ্ট এবং নিয়মিত সরবরাহ প্রয়োজন। ২৩শে নভেম্বর নোয়াখালির কয়েকটি রিলিফ কেন্দ্রের একটা সাধারণ হিসাব লইয়া দেখিয়াছিলাম; তথাকার আংশিক প্রয়োজন মিটাইতেই কমপক্ষে ৪০,০০০ কম্বল দরকার। বয়স্কদের জন্য বস্ত্র এবং শিশু ও বালক বালিকাদের আচ্ছাদনের প্রয়োজনীয়তা তো রহিয়াছেই। মোটকথা, দুইটা জেলার একটা বিধ্বস্ত সমাজকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং তাহাও যথেষ্ট অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে নহে। এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য যা করণীয় তাহার অনেকটাই বেসরকারী প্রয়াসের উপর নির্ভর করিবে। ঘটনার পর দুই মাস হইয়া গেল বটে; কিন্তু কর্তব্য ও দায়িত্ব বহনের প্রয়োজনীয়তা শেষ হয় নাই।

(১৬.১২.৪৬)

সপ্তম অধ্যায়ঃ

উৎখাত জনমণ্ডলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরার উৎখাত পরিবারসমূহকে আশ্রয়ের অভাবে আশ্রয়প্রার্থিনিবাসে ও রিলিফের অব্যবস্থায় যে ক্লেশ ভোগ করিতে দেখিয়া আসিয়াছি তাহার প্রতিকারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছি বটে; কিন্তু সে প্রতিকারও সাময়িক। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং একমাত্র প্রশ্ন হইল ইহাদের ভবিষ্যৎ। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত দুর্দিনের মধ্যে মহাপ্রস্থানের যাত্রা মনে করিয়াই ইহারা গৃহ ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে। এখন ইহারা কোথায় থাকিবে, কোথায় যাইবে? রিলিফে, আশ্রয়প্রার্থিনিবাসে ও নিরাশ্রয়ে যাহাদিগকে দেখিয়াছি তাহারা উৎখাত জনমণ্ডলীর এক ভগ্নাংশমাত্র। নিকটে থাকিবার স্থান না পাইয়া বহু পরিবার বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে এবং বাঙলার বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কি বাসস্থানের জন্য জেলায় জেলায় এবং প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে অথবা পুনরায় সুদিনের আশায় পুরাতন বাসভূমির দিকেই ফিরিয়া যাইবে? ফিরিয়া গেলেও পুনরায় সেই পুরাতন আবেষ্টনের মধ্যে বাস সম্ভব হইবে কি? যে বিপুল ধ্বংসস্তুপ দেখিয়া আসিয়াছি তাহার মধ্যে বাস করিবে কেমন করিয়া ? ধ্বংসস্তুপ অপসারণ করিবে কে? এই নিঃস্ব জনমণ্ডলীর জন্য নূতন বাসা বাঁধিয়া দিবে কে? যদি পুরাতন আবেষ্টনের মধ্যে বাস সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নূতন করিয়া গ্রামের পত্তন ও বাস নির্মাণের পরিকল্পনা করিতে হইবে। সে ক্ষেত্রেও সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই নূতন পত্তন ও পরিকল্পনার দায়িত্ব লইবে কে? কে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবে?

পুনর্যাত্রা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথাটা বলিতে ও শুনিতে যত সহজ কার্যতঃ ইহা তত সহজ নহে। ইহা কি সমস্যাসঙ্কুল ও কিরূপ দুঃসাধ্য, স্থানীয় অবস্থা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই তাহা বুঝিবে। বাঙলা গবর্ণমেন্ট এখন বিহার হইতে মুসলমান আনাইয়া পশ্চিম বাংলায় বসতি করাইবার ব্যবস্থাতেই নিযুক্ত; পূর্ব বাঙলার এই দুর্গত হিন্দু-সমাজের কথা কে ভাবিবে? যাহাদের বাড়ীঘর গিয়াছে, বাঙলা গবর্ণমেন্ট তাহাদের জন্য ২৫০ টাকা করিয়া বরাদ্দ করিয়াছেন। এই টাকাতে ঘর হওয়া দূরে থাকুক ঘরের একখানা চালও হইবে না। এদিকে লীগমন্ত্রিমণ্ডলের প্রচারকারীরা বলিতে লাগিয়া গিয়াছেন যে, নোয়াখালি-ত্রিপুরার জন্য ভাবিবার আর কিছুই নাই, যাহারা চলিয়া আসিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া গিয়া অক্লেশে যে যাহার স্থানে বসিয়া যাইতে পারে।

এখনও বহির্মুখী গতিঃ

'ভাবিবার আর কিছুই নাই'- ইহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইতে পারিলে বাঙলার গবর্নরকে, তাহার যোগ্য মন্ত্রিমণ্ডলকে ও তাঁহাদের আজ্ঞাবাহকদিগকে সর্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু দুই সপ্তাহ ঘুরিবার পর কলিকাতায় চলিয়া আসার দিনও দেখিলাম নোয়াখালি জেলার উপদ্রুত হিন্দু-সমাজের বহির্মুখী গতি বন্ধ হয় নাই। ২২শে নভেম্বর চৌমুহনী হইতে নৌকাযোগে আমরা যখন আমিষাপাড়া যাইতেছিলাম, তৎকালে বিপরীত দিক হইতে আগত পর পর দুইখানি নৌকা দেখিয়া বুঝিলাম দুইটি পরিবার গ্রাম ছাড়িয়া যাইতেছে। একখানি নৌকার আচ্ছাদনের বাহিরে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ছাড়িয়া যাইতেছেন বুঝি?" ভদ্রলোকটি একটু সঙ্কুচিত হইয়াই জবাব দিলেন—"হ্যাঁ, দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।"

২৫শে নভেম্বর আমরা চরমণ্ডল দেখিয়া চৌমুহনীতে ফিরি। রাত্রিতে চৌমুহনী হইতে লাকসাম যাত্রার সময়ে দেখি- বহির্মুখী জনতায় ষ্টেশন ভরিয়া গিয়াছে, অনেকে ষ্টেশনেই আশ্রয় লইয়াছে। ২৬শে নভেম্বর তারিখে আমরা চাঁদপুরে। ২৭শে নভেম্বর সকালে উঠিয়া দেখি রাত্রির মধ্যে বড় বড় নৌকা আসিয়া খালের মধ্যে সারি বাঁধিয়াছে। স্থানীয় জনৈক আইনজীবী জানাইলেন, ২৯খানি নৌকা করিয়া নোয়াখালির রায়পুর থানা হইতে আশ্রয়প্রার্থীর দল চলিয়া আসিয়াছে এবং উহার মধ্যে একখানিতে গৃহকর্তার স্ত্রীর মুখমণ্ডলে কুৎসিত আক্রমণের চিহ্ন বর্তমান। বস্তুতঃ আমরা যখন ছিলাম তখনও রায়পুর থানা অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। রায়পুর থানার এলাকার মধ্যে বাহিরের লোকের গতিবিধি তখনও ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই। ২রা ডিসেম্বর আমাদের কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের তারিখেও আগরতলা হইতে কুমিল্লা যাইবার পথে আখাউড়া ষ্টেশনে দেখিলাম রামগঞ্জ থানার অধীন গ্রামাঞ্চল হইতে বহুলোক গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম গুপ্তহত্যার আতঙ্কে তাহারা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

এই যে ক্রমবর্ধমান বহির্মুখী যাত্রা—ইহা যতদিন পর্যন্ত চলিবে, ততদিন পর্যন্ত উৎখাতগণের পুনর্যাত্রা ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা অবাস্তব কামনাই থাকিয়া যাইবে। অথচ উপদ্রুত অঞ্চলের যে অবস্থার মধ্য হইতে ইহারা চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে সেই অবস্থা প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহারই মধ্যে ইহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলা দুঃসাধ্য। বিপুল ধ্বংসস্তুপ ও চতুর্দিককার বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও যাহারা রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহস, দৃঢ়তা ও ধৈর্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কিন্তু যাহারা তখনও চলিয়া আসিতেছে তাহাদিগকেও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারি নাই "ফিরিয়া যাও"। মনে হইয়াছে, উহা না বলাই ভালো। যাহারা এমনভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, গ্রামের মধ্যেই আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, গুণ্ডা-মাতব্বরদের ছাড়পত্রের [এইরূপ ছাড়পত্রের একটী নিদর্শন এখানে দিতেছি। ইহা অবিকল উদ্ধৃত করিলামঃ

"এই ব্যক্তি হিন্দু ছিলে এখন মুসলমান হইয়াছে—হইকে (ইহাকে) সকলে সাহার্য্য (সাহায্য) ও সহাভুতি (সহানুভূতি) করিবে কেহ কটুবাক্য ও অন্যান্য প্রতি লক্ষ (লক্ষ্য) রাখিয়া ইসলামের সৌন্দয্য (সৌন্দর্য) রক্ষা করিয়া ইহকাল পরকাল হাছিল (হাসিল) করিবে।

ইতি

মৌলবী আবদুল হামিদ; নারায়ণপুর, রায়শ্রীরামপুর, নোয়াখালী।"

দীন মানিলে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম্ম কবুল করিলে, তবে এইরূপ ছাড়পত্র পাওয়া যাইত। ছাড়পত্র পাইলেও কেহ যখন গ্রাম হইতে বাহিরে যাইত তখন তাহার পুত্রকন্যা গ্রামের মধ্যেই সশরীরে জামিন থাকিত।] প্রয়োজন হইত, তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে সে অবরোধ যে আজ নাই; ইহা তাহাদিগকে অনুভব করিতে দিতেই হইবে। অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছিল যে, অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ হিন্দুরা কোনো আত্মীয়-স্বজনের সহিত যোগ রাখিতে পারিত না, অথবা কোনো আত্মীয়স্বজনের পক্ষে তাহাদের সহিত যোগ রাখিবারও উপায় ছিল না। অবরুদ্ধ হিন্দুদিগের গৃহে আত্মীয়স্বজন কেহ যাইতেছে দেখিলে অবরোধকারীরা তাহাদের নাম দিয়াছে "হিন্দু-গুণ্ডা"; গৃহকর্তার উপর আদেশ জারী হইয়াছে বাহির হইতে আত্মীয়স্বজন আসিলে তৎক্ষণাৎ লীগ অফিসে তাহাকে হাজির করাইতে হইবে; গৃহকর্তা তাহা না করিলে আগন্তুকের উপর মারপিট হইয়াছে এবং চৌকিদার আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ইউনিয়ন প্রেসিডেন্টের কাছে লইয়া গিয়াছে; যে সকল গৃহে আত্মীয়স্বজন আসিয়াছে রাত্রিতে সে গৃহের উপর পাহারা বসিয়াছে। এই আবদ্ধ অবস্থায় যে আতঙ্কিত মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছিল, সেই মনোভাব হইতে মুক্ত হইবার সুযোগ লোককে দিতে হইবে। বুঝিতে দিতে হইবে—ইচ্ছা করিলে তাহাদের বাহিরে যাইবার এবং বাহিরের লোকের তাহাদের নিকট আসিবার অবাধ অধিকার রহিয়াছে। যাতায়াতে, কোনোরূপ বাধা নাই—এই ধারণা লোকের মনে যতক্ষণ না পুনরায় বদ্ধমূল হইতেছে, ততক্ষণ আতঙ্ক কাটিবে না, উৎখাত এবং অপসারিতগণও গৃহে ফিরিতে চাহিবে না। গৃহের মায়া এখনও তাহাদের টানিয়া থাকে; কিন্তু তবুও তাহারা ফিরিতে পারে না।

গৃহের মায়াঃ

১৯শে নভেম্বর তারিখে কুমিল্লায় পৌঁছিয়া পরদিন আমরা যখন তথা হইতে রওনা হইব, তৎকালে আমাদের উপর ভরসা করিয়া পরিত্যক্ত গ্রাম ও গৃহসম্পত্তি দেখিয়া আসিবার জন্য স্থানীয় রিলিফ-কেন্দ্র হইতে দুই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গ লয়, নোয়াখালি সহর হইতে আরও একজন জোটে। তাহাদের গন্তব্যস্থল ছিল আমিষাপাড়ার সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে। তাহা তখনও সহজগম্য নহে, উপদ্রব চলিতেছে। ভরসা ছিল আমিষাপাড়া পরিদর্শনের সঙ্গে বা উহা হইতে ফিরিবার পথে আমরা তাহাদের গ্রামাঞ্চল হইয়া ফিরিব এবং তাহারাও গৃহাদি দর্শনের সুযোগ পাইবে। ২২শে নভেম্বর সন্ধ্যায় আমরা আমিষপাড়ায় পৌছিলাম; তখনও তাহারা আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সময়াভাবে তাহাদের অঞ্চলে আমাদের যাওয়া হইল না অথচ তৎকালে সেই সকল অঞ্চলে সদ্য-সঙ্ঘটিত যে সকল উপদ্রবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছিল, তাহাতে আমরাও ভরসা করিয়া তাহাদিগকে একক যাইতে বলিতে পারিলাম না। এতদূর আসিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া যাইবার সময়ে তাহাদের মুখে যে হতাশা ও বেদনাকাতর চিত্র দেখিয়াছিলাম তাহা ভুলিবার নহে। ২৪শে নভেম্বর শেষ রাত্রিতে উঠিয়া যখন আমরা মধুপুর রিলিফ ক্যাম্প হইতে মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য শ্রীরামপুর যাত্রা করি তখনও এইরূপ একটি করুণ ঘটনা ঘটে। অনুমান ৮ বৎসরের একটি বালক আমাদের শ্রীরামপুর যাইবার সংবাদ পূর্ব্বরাত্রিতেই সংগ্রহ করিয়াছিল এবং আমাদের যাত্রার অপেক্ষায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল। বালকটি তখন রিলিফ ক্যাম্পের বাসিন্দা—পিতামাতা নাই—শ্রীরামপুরের সন্নিকটস্থ গ্রামে তাহাদের বাস; একেবারে নিঃসহায় তথাপি গৃহের মায়া ছাড়িতে পারে না। ভোররাত্রিতে রওয়ানা হইবার সময় দেখি বালকটি সঙ্গ লইয়াছে; কিন্তু শ্রীরামপুরে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার গ্রাম তথা হইতেও খানিকটা দূর। আমরা আর যাইব না, বালকটিও একা যাইবে না। অগত্যা স্থানীয় জনৈক ভদ্রলোককে অনুরোধ করিলাম। তিনি সঙ্গী দিলেন। বেলা ১টা পর্য্যন্ত গান্ধীজীর সহিত আমাদের আলাপ চলিল, তাহারই মধ্যে বালকটি গ্রাম ও গৃহ দেখিয়া আসিল এবং আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায় রিলিফ ক্যাম্পের দিকে ফিরিল।

যাহা বলিলাম তাহা হইতে নিশ্চয়ই উপলব্ধি হইবে যে, লোকে গ্রামের মায়া, বাসগৃহের মায়া, ভূ-সম্পত্তির মায়া ছাড়িতে পারে নাই। মায়া যথেষ্টই আছে, তথাপি যে লোকে ছাড়িয়া গিয়াছে এবং যাইতেছে, তাহার কারণ প্রাণের হানির, সম্মানের হানির এবং পুনরায় আবদ্ধ হইয়া পড়ার আশঙ্কা। ২১শে নভেম্বর আমরা যখন নোয়াখালিতে তৎকালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, তাঁহার পরিবারের স্ত্রীলোকেরা মাত্র মাইল দশেক দূরে রহিয়াছেন; কিন্তু পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের তিনি সহরে আনাইতে পারেন নাই, দুবৃত্তগণ পথ হইতে নৌকা ফিরাইয়া দিয়াছে। সম্প্রতি কোম্পানীগঞ্জ থানা হইতে জনৈক সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে এইরূপ একটি সংবাদ প্রকাশও হইয়াছে। এইরূপ ঘটনা আতঙ্কের সৃষ্টি না করিয়া পারে না। এইজন্যই বলিতেছিলাম-কেহ চলিয়া আসিতেছে দেখিলে তাহাকে বাধা না দেওয়াই হয়ত আতঙ্ক প্রশমনে অধিকতর সহায়ক হইবে। অবাধ যাতায়াতের অধিকার ও সুযোগ অক্ষুন্ন আছে,- এই ধারণা লোকের মনে দৃঢ় না হইলে পুনরায় তাহাদিগকে গ্রামে ফিরানো বা বসানো যাইবে না। অবশ্য গ্রামের মধ্যে যাহারা আছে এবং যাহারা পরামর্শ চাহিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা থাকিতেই বলিয়াছি—ভয় ত্যাগ করিতে এবং সতর্ক থাকিতেও বলিয়াছি। তথাপি অবাধ যাতায়াত সম্বন্ধে লোকের মনে নিশ্চয়তা জাগাইবার প্রয়োজনও অনুভব করিয়াছি বিশেষভাবেই।

আতঙ্ক সৃষ্টিতে সরকারী দায়িত্বঃ

উপদ্রুত ও আবদ্ধ জনমণ্ডলীর মনে আতঙ্ক সৃষ্টির দায়িত্ব হইতে স্থানীয় শাসনকর্মচারীরাও অব্যাহতি পাইবেন না। ২০শে নভেম্বর তারিখে চাঁদপুরে পৌছিয়া জেলার শাসনকর্মচারীবিশেষের আচরণের যে বিবরণ পাইয়াছিলাম তাহাই এ অভিযোগ প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট। কলিকাতা হইতে আগত একটি বিশিষ্ট সেবা-প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা শ্রীযুত শরৎচন্দ্রের নিকট এই বিবরণ দাখিল করেন। অক্টোবরের শেষভাগের ঘটনার সময়ে চাঁদপুর মহকুমার এক অঞ্চলে উপদ্রুত সমাজের ৩০০০ লোক অবরুদ্ধ হয়। ধর্মান্তর না হয় মৃত্যু—এই দুই বিকল্প তাহাদের সম্মুখে। এই অবস্থায় তাহাদের মধ্যে কলেরা দেখা দেয়। মহামারী-বিপন্নদের সেবা করিতে যাইবার জন্য উক্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ত্রিপুরা জেলার উক্ত প্রধান শাসন-কর্মচারীর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। তাহাতে উক্ত শাসন-কর্ম্মচারী জবাব দেন, "What is the harm if these three thousand people are converted to Islam?"—"এই তিন হাজার লোক যদি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেই, তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি?" সেবা প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জানান যে, ধর্মান্তরের কথাটাই অফিসার মহাশয়ের প্রধান আগ্রহের বিষয় হইলেও তাহারা উহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন না, তাহারা বিপন্নের সেবা করিতে আসিয়াছেন এবং তাহারই জন্য উক্ত স্থানে যাইতে চাহেন। তথাপিও শেষ পর্যন্ত অফিসারটি কর্ম্মীদিগকে উক্ত স্থানে নিরাপদে পৌঁছাইবার জন্য কোনো সাহায্য করিতে সম্মত হন নাই। তাহার এই আচরণে এবং কর্মীদের আবেদনের উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়—সরকারীমহল কি মনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত এবং স্থানীয় শাসনকর্মচারীরা কি মনোবৃত্তি লইয়া কাজ করিয়াছেন। স্থানীয় কর্মচারীদের এই মনোবৃত্তির প্রতিক্রিয়া উপদ্রুত জনসাধারণের আতঙ্ক বৃদ্ধিতে কিরূপ সহায়তা করিয়াছে তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

কর্তব্যে অবহেলা ও শৈথিল্যঃ

আতঙ্কবৃদ্ধিতে এই সক্রিয় সহায়তা ছাড়া স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা এবং শৈথিল্যও উৎখাত জনগণের পুনর্যাত্রা ও পুনর্বসতির বিঘ্ন ঘটাইতেছে। নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা যখন পরিদর্শনে গিয়াছিলাম তখন ঘটনার পর দেড় মাস হইতে চলিয়াছে। কিন্তু দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, ঘটনার সময়ে খণ্ডিত ও ভগ্ন রাজপথসমূহ তখনও মেরামত হয় নাই। চৌমুহনী হইতে রামগঞ্জ যাইবার পথ অন্তত ছয় জায়গায় খণ্ডিত ও বিধ্বস্ত—এমনভাবে বিধ্বস্ত যে, গাড়ী লইয়া চলা অসম্ভব। শুনিয়াছি এই অঞ্চলে মিলিটারী আসিবার পূর্বে এই পথটি একেবারে অগম্য হইয়াছিল। অথচ ইহাই উপদ্রুত অঞ্চলে যাইবার প্রধান রাজপথ। মিলিটারীর উদ্যোগে ভাঙ্গনগুলিতে গাছ ও মোটা লোহার জাল ফেলিয়া যে আচ্ছাদন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া গাড়ী অতি কষ্টে যাওয়া আসা করে। প্রত্যেকটা ভাঙ্গনের মুখে আসিয়া যাত্রীদিগকে গাড়ী হইতে নামিতে হয় এবং গাড়ী ভাঙ্গন পার হইয়া গেলে পুনরায় উঠিতে হয়। এইভাবে যাইতে আমাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। এ পথটিতে তবু জল ছিল না। যে সকল পথের ভাঙ্গন জল-প্লাবিত হইয়াছে তাহাতে গাড়ী একেবারে অচল। ২২শে নভেম্বর তারিখে আমিষাপাড়া যাওয়ার

[আমিষাপাড়ায় বারাহী মন্দিরের ধ্বংস আমরা পরিদর্শন করি। ইহা একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থানরূপে গণ্য। প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বারাহীমূর্তি কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া এই প্রাচীন মূর্তির প্রতিষ্ঠার সময় দিগভ্রম হওয়াতে মূর্তির স্থাপনে ভুল হয়। শক্তিমূর্তি প্রধানতঃ দক্ষিণমুখী না হয় পশ্চিমমুখী ভাবে স্থাপিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে পূর্বমুখী ভাবে স্থাপিত। এই ভূল হইতেই ভুলুয়া (ভুল হুয়া) পরগণার নামকরণ বলিয়া শোনা যায়। কৃষ্ণপ্রস্তরের মূর্তি কুঠারের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। মূর্তির খণ্ডিত অংশগুলির কিছু ছিল বেগমগঞ্জ থানায়, কিছু ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের নিকট, কিছু শরৎচন্দ্র সংগ্রহ করেন। কিছু ছিল হাওড়ায় উদ্বাস্তু শিবিরে সেবায়েতদিগের এক বংশধরের নিকট। বেগমগঞ্জ থানায় গিয়া তথাকার সংগৃহীত অংশগুলি দেখিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সমর্থ হই নাই। মূর্তির অংশগুলি একত্র করিয়া এবং পূর্বেকার চিত্র দেখিয়া অনুরূপ মূর্ত্তি গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠার কথা শরৎচন্দ্রের সহিত হইয়াছিল। বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের গুরু বোম্বাইয়ের শ্রীকৃষ্ণজীবনজী মহারাজ এই ভ্রমণে আমাদের সঙ্গী ছিলেন।

তিনিও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু কার্যতঃ শেষ পর্যন্ত তাহা হইয়া উঠিল না দেখিতেছি। এখানে সেবায়ৎ পরিবারের একটী বালকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আক্রমণের সময়ে বেতস জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া সে আত্মরক্ষা করে এবং একাদিক্রমে তিন দিন সেই ভাবে থাকে। আমাদের সহিত যখন সাক্ষাৎ তখনও গায়ে বেতকাঁটার ক্ষত রহিয়াছে।]

ব্যবস্থা করিতে আমাদিগের এই অভিজ্ঞতা হয়। চৌমুহনী হইতে আমিষাপাড়া যাইবার বাঁধান পথ আছে, মোটরে ঘন্টাদুই লাগে। কিন্তু উপদ্রবের উদ্যোগেই আমিষাপাড়া হইতে মাইল দুয়েক আগে এই পথটি কাটিয়া দেওয়া হয় এবং ভাঙ্গনের ভিতর দিয়া জল বহিতে থাকে। মোটরে ভাঙ্গন পর্যন্ত গিয়া তথা হইতে নৌকায় যাইতে পারিলেও সময় সংক্ষেপ হইত, কিন্তু সেইখানে গিয়া নৌকা পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং গাড়ীর চেষ্টা ছাড়িয়া চৌমুহনী হইতেই আমাদের নৌকায় যাইতে হইল, এবং যে কাজ গাড়ীতে দুই ঘন্টার মধ্যে পৌঁছিয়া সারিয়া আসা চলিত, সেখানে যাইবার পথেই আমাদের ৫৬ ঘন্টা লাগিয়া গেল। ফিরিবার সময়েও ঐ একই অবস্থা। অথচ স্থানীয় জেলাবোর্ড এবং গবর্ণমেন্ট মিলিয়া চেষ্টা করিলে রাস্তার ভাঙ্গনগুলি বহুদিন পূর্বেই মেরামত করিয়া ফেলিতে পারিতেন।

শাসনশক্তিতে লোকের অনাস্থাঃ

এই সমস্ত ব্যাপারের সম্মিলিত ফল যাহা হইয়াছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। লোকে গবর্ণমেন্টের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে। উৎপীড়ক প্রতিবেশীসম্প্রদায়ের সম্বন্ধে উৎপীড়িত সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আশঙ্কা যে গভীরতম হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। কিন্তু ইহা সত্বেও উৎপীড়িত সম্প্রদায়ের এইভাবে দলবদ্ধ অভিনিষ্ক্রমণ ঘটিত না যদি তাহারা গবর্নমেন্টের সদভিপ্রায় ও কার্যকারিতার উপর আস্থা রাখিতে পারিত। ঘটনাপরম্পরা হইতে, সরকারী কর্ম্মনীতি হইতে এবং সরকারী কর্মচারীদের আচরণ হইতে লোকের মনে ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, অনিচ্ছায় হউক, অবহেলায় হউক, শাসনশক্তির প্রভাব বাঙলার প্রান্তবর্তী এই জেলাটি পর্যন্ত পৌঁছিতেছে না।—ইহা অপরাধীকে দমন করিতে বা নিরপরাধকে অপরাধীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয় অনিচ্ছুক, নয় অপারগ। রাজশাসনের অক্ষমতা এবং অপরাধীর প্রশ্রয়লাভ-উৎখাতগণের পুনর্যাত্রা ও পুনর্ব্বসতির ইহাই সর্বপ্রধান অন্তরায়। শূন্যগর্ভ আবেদনের আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া বাঙলা গবর্ণমেন্ট এই বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছেন কি?

২৩.১২.৪৬

অষ্টম অধ্যায়ঃ

পুনর্বসতি ও জেনারেল বুসারঃ

অক্টোবর মাসে নোয়াখালি-ত্রিপুরায় আমাদের প্রথম পরিদর্শনের অব্যবহিত পরেই ঘুরিয়া আসিয়া ইষ্টার্ণ কমাণ্ডের জিওসি-ইন-সি লেঃ জেনারেল বুসার লালদীঘির দপ্তরখানায় ২৬শে অক্টোবর তারিখে এক প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করিয়া আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ইহাতে উপস্থিত ছিলাম, দেখিলাম জেনারেল বুসার অবস্থার গুরুত্ব একেবারেই যেন উড়াইয়া দিয়া বলিলেন, ১০/১৫ দিনের মধ্যেই লোকের নষ্ট আস্থা ফিরাইয়া আনিব এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুনর্ব্বসতি করাইয়া দিব। অব্যবহিত পূর্বেই অবস্থাটা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং বিস্ময়ে অবাক হইয়া সাহেবকে কলিকাতার অবস্থাটা স্মরণ করাইয়া দিলাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগরী কলিকাতা-বাঙলার রাজধানী। এইখানে একেবারে গভর্ণমেন্টের নাকের উপর সহরের পূর্বাঞ্চল হইতে শান্তিপূর্ণ অধিবাসীরা ১৬ই আগষ্টের সাম্প্রদায়িক আক্রমণের ফলে সেই যে হঠিয়া আসিয়াছে দুই মাসের মধ্যেও গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে স্ব স্ব স্থানে ও আবাসে পুনরায় বসাইতে পারেন নাই। এই অবস্থায় বিশ্বাস করিতে হইবে যে বাঙলার প্রান্তবর্তী এই জেলার অভ্যন্তরভাগ হইতে উৎসাদিত এবং কল্পনাতীত প্রকারে উৎপীড়িত একটা গোটা সমাজকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুনরায় বসাইয়া দেওয়া যাইবে? কথাটা সাহেবের ভাল লাগে নাই। তিনি আরও জোর করিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ করিবই, যদি না পারি; তখন আমাকে অভিসম্পাত করিবেন।”

তাঁহার এই উক্তি শুনিয়া তখনই সকলে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তিনি প্রকৃত অবস্থা কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নাই, স্থানীয় শাসনকর্ম্মচারীরা যাহা সাজাইয়া গুছাইয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, তিনি তদনুযায়ী কথা কহিতেছেন। জেনারেল বুসারের এই উক্তির তিনসপ্তাহাধিককাল পরে পুনরায় দেখিতে গিয়া জেলার বিধ্বস্ত ও জনশূন্য অঞ্চলসমূহের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে পরিভ্রমণ করিতে করিতে জেনারেল বুসারের এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ হইত এবং বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম—এত বড় দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত কর্ম্মচারী এত বড় অবিশ্বাস্য কথা কহিলেন কেমন করিয়া? যে সকল স্থানীয় কর্মচারী তাহাকে এই অভিমত গঠনের তথ্য যোগাইয়াছে তাহারাই বা কিরূপে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত কাজ করিল?

বুসারের ভ্রমণ ও সিদ্ধান্তঃ

জেনারেল বুসারের কথাটা বিশেষ করিয়া উঠাইলাম, কারণ ঘটনার ও অবস্থার সহিত তুলনায় তাহার অভিমত যতই অসার হউক ইহার অন্য একটা গুরুত্ব আছে। তিনি আপনার মতানুযায়ী ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট একটা রিপোর্ট পেশ করেন। সম্ভবত সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারত গবর্ণমেন্টের অভিমত গঠিত হইয়া বিলাতে প্রেরিত হইয়াছে। জেনারেল বুসার ২০শে অক্টোবর কলিকাতায় আসেন; ২১শে অক্টোবর রাত্রিতে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া ২২শে চাঁদপুর পৌঁছেন; তথায় ব্রিগেডিয়ার থাপারের সহিত আলোচনা করিয়া চাঁদপুর হইতে লাকসাম, লাকসাম হইতে সোনাইমুড়ী, তথা হইতে চৌমুহনী এবং নোয়াখালি হইয়া (অর্থাৎ উপদ্রুত অঞ্চলের বাহির হইতে উহার উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত দিয়া) দুই দিনে ভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বহিরঙ্গ দর্শন ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া তিনি ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট যে রিপোর্ট - দিয়াছেন, সে

রিপোর্টটি কিন্তু সংক্ষিপ্ত নহে। রিপোর্টটি তিনি প্রেস কনফারেন্সে দেখাইয়াছিলেন এবং তাহা হইতে কিছু কিছু পড়িয়াও শুনাইয়া ছিলেন।

ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ রিপোর্ট হইতে জেনারেল বুসার অনুগ্রহ করিয়া যেটুকু প্রেস কনফারেন্সে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে তাহার অভিমত খানিকটা জানা গিয়াছিল এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনায় জানা গিয়াছিল আরও কিছু। লিখিত রিপোর্ট হইতে পাওয়া গেল তাঁহার তিনটি সিদ্ধান্তঃ-

(১) উপদ্রুত অঞ্চলে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের সাধারণ অভ্যুত্থান ঘটে নাই।

(২) উপদ্রব করিয়াছে বহিরাগত গুণ্ডারাই—স্থানীয় লোক কিছু কিছু তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল।

(৩) উপদ্রবের চূড়ান্ত বিবরণে প্রমাণিত হইবে যে, উহার প্রাথমিক সংবাদে অত্যন্ত অত্যুক্তি করা হইয়াছিল (grossly exaggerated)।

ইহার পর আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরে জেনারেল বুসার তাঁহার এই সকল সিদ্ধান্তের হেতু কিছু কিছু প্রকাশ করেন। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের ব্যাপক সাধারণ অভ্যুত্থান ঘটে নাই এই সিদ্ধান্তের হেতুস্বরূপে তিনি বলিলেন তাহা হইলে সহরগুলি রক্ষা পাইত না; কিন্তু বস্তুতঃ সহরগুলি আক্রান্ত হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত একবার মানিয়া লইলে পরবর্তী সিদ্ধান্তটিও সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া পড়ে যে, উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে প্রধানতঃ বহিরাগত ও কিছু কিছু স্থানীয় গুণ্ডাদের দ্বারাই। যে বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া দিনের পর দিন ব্যাপক উপদ্রব চলিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম— 'মাত্র গুণ্ডার দ্বারা ইহা সম্ভব কিনা'। উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন "কেন হইবে না? হাজারখানেক গুণ্ডার দ্বারা ইহা বেশ ঘটিতে পারে, প্রতি ২০ বর্গ মাইলের জন্য ৫ জন গুণ্ডাই যথেষ্ট।" ১০ হাজার, ১৫ হাজার লোক মিলিয়া এক একটি অঞ্চল আক্রমণ করিয়াছে এ কথাটাকে তিনি একেবারে উড়াইয়াই দিলেন, বলিলেন—"১৫ হাজার লোকের দাঁড়াইতে কত জায়গা লাগে, একবার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন কি—৫ মাইলের কম নহে।" এইরূপ যাহার ধারণা তিনি যে বলিবেন প্রাথমিক রিপোর্টে অত্যন্ত অত্যুক্তি করা হইয়াছে এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে তাহাই প্রমাণিত হইবে—ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

তৈয়ারী-করা পাঠের পুনরাবৃত্তিঃ

দুই দিনের মধ্যে উপদ্রুত অঞ্চলের বাহির দিয়া কয়েকটি সহর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা লইয়া জেনারেল বুসারের এই বিবৃতি প্রেস কনফারেন্সে শুনিবার সময়েই অনুভব করিয়াছিলাম যে, নোয়াখালি ও ত্রিপুরার শাসনকর্মচারীদের তৈয়ারী-করা পাঠই তিনি আমাদের সম্মুখে পড়িয়া যাইতেছেন এবং তাহাই রিপোর্টের আকারে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট যাইতেছে। নোয়াখালি-ত্রিপুরার অভ্যন্তরের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া অবধি এই রিপোর্টের ভিত্তিহীনতা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছি। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়ের ব্যাপক সর্ব্বসংহারী আক্রমণ ঘটিয়াছিল কি না সে বিষয়ে জেনারেল বুসারের কিছু মাত্র সংশয় থাকিত না যদি তিনি অভ্যন্তরের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিতেন এবং যে শাসনকর্মচারীদের অক্ষমতায় বা ঔদাসীন্যে উপদ্রবকারীরা সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাদেরই কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া না লইতেন। সহর কয়টিতে উপদ্রব না ঘটিবার হেতু প্রেস কনফারেন্সে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই এখন অধিকতর দৃঢ়তার সহিত পুনরায় বলিতে পারি—প্রথম কারণ, উপদ্রুত সম্প্রদায়ের সহরে সংখ্যাধিক্য ও প্রভাবাধিক্য; দ্বিতীয় কারণ, সহরে শাসনকর্মচারীদের অবস্থিতি, তৃতীয় কারণ, বাহিরের দৃষ্টি হইতে যতটা সম্ভব এবং যতদিন সম্ভব অন্তরাল রাখিয়া নির্ধারিত অঞ্চলে উপদ্রবকারীদের নির্ব্বিবাদে অভিপ্রায় সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা; সহর শুদ্ধ ঘটাইয়া লইলে ইহা কোনমতেই সম্ভব হইত না। কেবল সহর কেন? উপদ্রুত অঞ্চলের প্রধান রাজপথের দুই পার্শ্ব দেখিয়া আসিয়াও জেনারেল বুসার

এই কথাই বলিতে পারিতেন। পথের দুই পার্শ্ব ছাড়িয়া দিবার কারণ যাহা, সহর কয়টি ছাড়িয়া দিবারও অন্যতম কারণ তাহাই। ব্যাপক অভ্যুত্থানের কথা অস্বীকার করিবার জেনারেল বুসরের আর একটা কারণ এই যে, ১৫ হাজার লোকের দাঁড়াইতেই ৫ মাইল জায়গা লাগিয়া যায়। হয়তো মিলিটারী মস্তিষ্কের হিসাবে তাহাই লাগে। আমরা কিন্তু নিত্যই দেখিয়া থাকি ১৪/১৫ হাজার লোকের সভা কলিকাতার একটা পার্কের এক কোণে পড়িয়া থাকে। চূড়ান্ত বিবরণের দ্বারা ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ খণ্ডিত হইবে ইহাই জেনারেল বুসারের অভিমত। কিন্তু সত্যকার চূড়ান্ত বিবরণ যদি কোনদিন প্রকাশিত হয়, তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিবে যে ঘটনার সামান্য অংশই প্রাথমিক বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছিল। তবে প্রশ্নোত্তরে এই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি জেনারেল বুসারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল যে, নোয়াখালির স্থানীয় যাহারা এখনও মিলিটারীতে নিযুক্ত আছে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই উপদ্রবে অংশ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। জেনারেল বুসার বলিয়াছিলেন যে তাহাদের বিচারার্থ আদালতের নিকট সমর্পণ করা হইবে। আদালতের বিচার হইলে প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনের বিশেষ সহায়তা হইত; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সৎসাহস বোধ করি কর্তৃপক্ষের হইয়া উঠিল না। নোয়াখালির উপদ্রবকে লঘু করিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য উর্দ্ধতনমহলে যে ষড়যন্ত্র চলিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় এইরূপ অপরাধীর প্রকাশ্য বিচারে তাহা সম্পূর্ণভাবেই ফাঁস হইয়া যাইত।

বুসারের অভিমত খণ্ডনঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরার স্থানীয় শাসনকর্ম্মচারীরা জেনারেল বুসারকে কি পাঠ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন জানি না; জেনারেল বুসার ভারত গবর্নমেন্টকে যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহাও প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু উপদ্রুত সম্প্রদায়ের অত্যন্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিরাও আক্রমণোদ্যোগের যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহা জেনারেল বুসারের মতবাদকে সম্পূর্ণভাবেই খণ্ডিত করে। তাহাদের প্রদত্ত বিবরণমতে আক্রমণের উদ্যোগকার্যে ছিলঃ—

(১) প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক

(২) স্থানীয় হাইস্কুলের ও কলেজের ছাত্র

(৩) জেলায় প্রত্যাগত কলেজের ছাত্র

(৪) বেকারগণ। এই চতুর্থ শ্রেণীর মধ্যে পূর্বতন মিলিটারীদের ধরা যাইতে পারে। একটি সুবিদিত কিশোরীহরণের [করপাড়ায় নিহত রায় সাহেব রাজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর গৃহ হইতে অপহৃত নমিতা রায় চৌধুরী।] ব্যাপারে অগ্রবর্তী বলিয়া যিনি অভিযুক্ত তিনি স্থানীয় এক হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক। একাধিক পাশব ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের নায়ক [পূর্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত গোপাইরবাগ গ্রামের দাস পরিবারের হত্যাকাণ্ডের নায়ক, আবুল কাসেম। এই ব্যক্তি তৎকালীন পাবনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাগিনেয়।] কোনো ম্যাজিষ্ট্রেটের ভাগিনেয়। দ্বিতীয়টিকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতেই সুস্পষ্ট হয় আক্রমণ কোন শ্রেণীর লোকের দ্বারা হইয়াছে এবং কিভাবে হইয়াছে। বাটাদল ও ডানলপদলের [বাটা কোম্পানী ও ডানলপ কোম্পানীর পূর্ববঙ্গবাসী এক শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারী। কলিকাতায় ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্টের হাঙ্গামার পর ইহারা ছুটী লইয়া দল বাঁধিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ নোয়াখালি ত্রিপুরা অঞ্চলে গিয়াছিল।] নাম ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাহারও পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। মোটের উপর সম্প্রদায়বিশেষের আবালবৃদ্ধবনিতার অধিকাংশকে বা একটা বৃহৎ অংশকে যদি “গুণ্ডা” আখ্যা দেওয়া যায়, তাহা হইলেই নোয়াখালি-ত্রিপুরার আক্রমণকে গুণ্ডার আক্রমণ বলা যাইতে পারে, নতুবা নহে।

নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রব বহিরাগতদের দ্বারা এবং প্রধানত গুণ্ডাদের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে—এই মতবাদ যাঁহারা প্রচার করিয়াছেন, উপদ্রুত ও উৎখাতগণের পুনরাগমন ও পুনর্ব্বসতির তাঁহারাই প্রধান অন্তরায় এবং সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিবন্ধক। স্থানীয় ক্ষুদ্রতর শাসকগণ ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন

এবং বাহিরের বৃহত্তর শাসকগণ ইহা নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া এই কৈফিয়তে তাঁহাদের ও আপনাদের দায়িত্ব এড়াইতে চাহিয়াছেন। উপদ্রুত অঞ্চলের বাহির হইতে লব্ধ কয়েক ঘন্টার মূল্যবান অভিজ্ঞতায় ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট জেঃ বুসার কি রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহা যদি কোনোদিন প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বোঝা যাইবে উর্দ্ধতন ও অধস্তন কর্তৃপক্ষ মিলিয়া ভিতরে ভিতরে কি সাজাইতেছিলেন। বাহির হইতে দেখিয়া মনে হয় গুণ্ডাতত্ব প্রবর্তনের দ্বারা উপদ্রবের একটা সহজগ্রাহ্য কৈফিয়ৎ উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং প্রকৃত উপদ্রবকারীদের দায়িত্ব এড়াইবার সুযোগ ঘটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। নোয়াখালি হইতে এবং ত্রিপুরার অংশবিশেষ হইতে জনসমাজ যে উৎখাত হইল, তাহার প্রকৃত কারণ ইহার দ্বারা চাপা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পুনর্ব্বসতির যাহা প্রকৃত বাধা তাহার প্রতিকারে বাধা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে এই দায়িত্ব হইতে জেনারেল বুসারও অব্যাহতি পাইবেন না।

বুসারের ব্যর্থতাঃ

জেঃ বুসারের নিশ্চয়তা দানের পর দুইমাস হইয়া গেল। এখনও, এবং মহাত্মাজীর উপস্থিতি সত্ত্বেও, উৎখাত জনমণ্ডলী স্বস্থানে ফিরিতে পারে নাই। নিশ্চয়তা ব্যর্থ হইলে জেনারেল বুসার তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে বলিয়াছিলেন। কাহাকেও অভিসম্পাত করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। কিন্তু আপনার উক্তির এই প্রকাণ্ড ব্যর্থতা হইতে এই অতি বিশ্বাসী অফিসারটি অনুতাপের সহিত উপলব্ধি করিয়া লউন বাস্তব অবস্থার সহিত তুলনায় তাহার প্রাথমিক অনুমান ও নির্ধারণ কত বড় হঠকারী এবং কত বড় মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে; স্থানীয় কর্মচারীরা তাহাকে কি ভাবে বিভ্রান্ত করিয়াছে; তাহাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট, তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে কত বড় মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে এবং এই মিথ্যার প্রশ্রয়ের দ্বারা একটা দুর্গত জনসমাজের চরম দুঃসময়ের ক্ষণে কি ক্ষতি তিনি ঘটাইয়াছেন।

(২৭.১২.৪৬)

বহিরাগত ও গুণ্ডাঃ

কেবল মাত্র বহিরাগতদিগের দ্বারা বা মাত্র গুণ্ডার দলের দ্বারা নোয়াখালি-ত্রিপুরার এত বড় ধ্বংসকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে - ইহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে একটা সমগ্র জনসমাজ এমন করিয়া উৎখাত ও ছন্নছাড়া হইয়া চলিয়া আসিত না; চলিয়া আসিলেও ফিরিয়া যাইতে এত ইতস্তত করিত না। যাহারা উপদ্রব করিয়াছে তাহারা যে সকলেই পরিচিত, সকলেই দীর্ঘকালের প্রতিবেশী, অনেকের সহিত পুরুষানুক্রমের সম্পর্ক! পারিবারিক ভৃত্য, যাহারা দীর্ঘকালের বিশ্বস্ততার ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্কে থাকিয়া অত্যন্তরীণ সকল সংবাদ জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, পাড়ার মাতব্বর যাহারা বরাবর আশ্বাস দিয়া আসিয়াছেন যে, তাহাদের কাঁধে যতক্ষণ মাথা আছে, ততক্ষণ প্রতিবেশী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ নিরাপদ, দীর্ঘ পরিচিত নৌকার মাঝি, যে পূর্বদিনেও পৌঁছাইয়া দিয়া গিয়াছে, ইহারাই পূর্বদিন সন্ধ্যায়ও চিরাচরিত সম্পর্কে কাজ করিয়া গিয়া যখন পরদিন প্রাতে অকস্মাৎ দল বাঁধিয়া আক্রমণ, ধ্বংস, হত্যা, উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, ধর্মনাশ প্রভৃতি ঘটাইয়াছে, তখন উৎপীড়িতগণের মনে প্রতিবেশীর সম্পর্কে বা মনুষ্যচরিত্রে বিশ্বাসের মূলভিত্তি বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। উপদ্রুতেরা ইহাদিগের সকলকেই চেনে এবং জানে ফিরিয়া গিয়া ইহাদের মধ্যেই পড়িতে হইবে, ইহাদের লইয়াই চলিতে হইবে এবং বাধ্য হইয়া ইহাদেরই পুনরায় গৃহকার্যে বহাল করিতে হইবে। এই চিন্তাই তাহাদের মনকে পীড়িত ও বিমুখ করিতেছে এবং ইহাই সমস্যা। দীর্ঘকালের বিশ্বাসের সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া যাহারা উৎপীড়ন ও অবর্ণনীয় অসম্মান করিয়াছে, যাহারা প্রত্যক্ষে পুত্রহন্তা, প্রত্যক্ষে নারীনিগ্রহী— উপদ্রুতেরা ফিরিয়া গিয়া কি তাহাদেরই আবার কাজে বহাল করিতে পারিবে? ভরসা করিয়া তাহাদের সহিত বিশ্বাসের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া চলিতে পারিবে? অথচ উপায়ান্তরই বা কি? তাহারা যে ফিরিবার সময়ে নিত্য প্রয়োজনীয়

গৃহকর্মে সহায় হইবার উপযুক্ত আপন আপন লোক লইয়া যাইতে পারিবে, তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? উপদ্রবকারীরা যদি বাহিরের লোক হইত, তাহা হইলে এই সমস্যা দেখা দিত না। উৎখাতদিগের পুনরাগমন ও পুনর্ব্বসতি সহজসাধ্য হইত।

লোক চক্ষে ধূলি দিবার প্রয়াসঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরার ধ্বংসকাণ্ডের সমস্ত ব্যাপার বহিরাগত ও গুণ্ডাদিগের নামে চালাইয়া দিবার বুদ্ধিটা যাহাদের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাদের উদ্ভাবনী বুদ্ধির প্রশংসা করিব নিশ্চয়ই। গুণ্ডা ও বহিরাগতদিগের উপর দায়িত্ব চাপানো ছাড়া অব্যাহতি পাইবার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু উপদ্রুত অঞ্চলে পৌঁছিবার পথের দুর্গমতা যাহারা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে যে, এই বহিরাগত-থিয়োরী ও গুণ্ডা-থিয়োরী কত বড় মিথ্যা! ঘন সন্নিবিষ্ট বন ও বাগানের মধ্য দিয়া, জটিল জলপথ বাহিয়া, পদভর-অসহিষ্ণু ও ভঙ্গপ্রবণ সুপারির ও বাঁশের সাঁকো মুহুর্মুহু পার হইয়া অপরিচিত ও বহিরাগতের পক্ষে অকস্মাৎ এই অভ্যন্তরভাগে প্রবেশলাভ করাই দুঃসাধ্য, দল বাঁধিয়া উপদ্রব করা তো দূরের কথা। পথ এমন দুর্গম ও বাধাসঙ্কুল যে, অক্টোবর মাসের শেষভাগেও উপদ্রুত অঞ্চল দেখিতে যাহারা নৌকায় যাইতে চাহিয়াছে, তাহাদিগের ১৯/২০ মাইল যাইতে প্রতি নৌকার ভাড়া দিতে হইয়াছে ৩০০/৪০০ টাকা। নভেম্বরের শেষভাগে আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন মূল রাজপথ (পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধ্যে মধ্যে ভগ্ন ও খণ্ডিত) দিয়া মাত্র ৩৪ মাইল যাতায়াত করিতে এক একখানি ট্যাক্সিকে ভাড়া দিতে হইয়াছে ১২০ টাকা। নৌকার মাঝি এবং ট্যাক্সির চালক সকলেই স্থানীয় মুসলমান। যদি বাহিরের লোক বা গুণ্ডা কিছু আসিয়াও থাকে, তাহা হইলে ইহা নিশ্চিত যে স্থানীয়েরাই তাহাদিগকে আনাইয়াছে। স্থানীয়দিগের সাহায্য ছাড়া তাহারা আসিতে পারে নাই এবং তাহাদিগকে আমদানী করিবার জন্য স্থানীয়েরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

লোকচক্ষে ধূলিনিক্ষেপের জন্য যাহারা বহিরাগতের ও গুণ্ডার থিয়োরী উদ্ভাবন করিয়া ছিল, তাহারা তাহাদের বুদ্ধির যথাসাধ্য প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে পাঠ লাইয়া গ্রামের লোকে এই দুই থিয়োরী কার্যতঃ যেভাবে প্রয়োগ করে- তাহাতে বড় কৌতূহলজনক অপপ্রয়োগ ঘটিয়া থাকে। রামপুরে উৎপীড়ক সম্প্রদায়ভুক্ত, লোকদিগকে যখন জিজ্ঞাসা করা যায়, তখন তাহারা শ্যামপুরের দিকে দুই বাহু নিক্ষেপ করিয়া বলে, ঐ দিক হইতে বাহিরের লোকেরা আসিয়া সব কাণ্ডকারখানা করিয়া গিয়াছে। আবার শ্যামপুরের ঘটনা সম্বন্ধে তথাকার উৎপীড়ক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা রামপুরের উপর সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দেয়। বহিরাগত-গুণ্ডা-থিয়োরী যাহারা উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহারা শিখাইতে চাহিয়াছিল জেলার বাহিরের লোক, কিন্তু উপদ্রবকারীরা ইহার অর্থ বুঝিয়া লইয়াছে ভিন্ন গ্রামের লোক। আমাদের গ্রামের লোক কিছু করে নাই,—মাত্র এইটুকু বলিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত বোধ করে। উপদ্রুত সম্প্রদায়ের লোকেরা স্পষ্টতঃ ইহার কোনো প্রতিবাদ করে না, কিন্তু পাশে পাশে পথ চলিতে চলিতে দৃষ্টির সঙ্কেতে ও অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে উপদ্রবকারী প্রতিবেশীদিগকে নিঃশব্দে দেখাইয়া দিয়া থাকে। একটিমাত্র ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম দেখিয়াছিলাম। তথাকার বিবরণ কথোপকথনের আকারে দিতেছিঃ-

দুইটি বিশেষ ঘটনাঃ

বিধ্বস্ত বাজারে (হাইমচর বাজার) সমবেত জনতা। বিভিন্ন পক্ষের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত। জনৈক প্রৌঢ়বয়স্ককে শরৎচন্দ্রের (নেতাজী সুভাষ বোসের অগ্রজ) সহিত পরিচয় করাইয়া বলা হইল,

তিনি স্থানীয় মাতব্বর এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। বিশাল ও বিস্তৃত ধ্বংসস্তুপের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন— "আপনারা থাকিতে এই সব ঘটিল?"

মাতব্বর—"আমরা কি করিব? নোয়াখালির দিক হইতে একেবারে ৫/৭ হাজার লোক এক সঙ্গে আসিয়া এই কাণ্ড করিয়া গিয়াছে।"

কথা শুনিয়া উপদ্রুত সম্প্রদায়ের জনৈক বৃদ্ধ উত্তেজনার সহিত আগাইয়া গিয়া কহিলেন-"মাথার উপরে ভগবান আছেন। উপরের দিকে চাহিয়া কথা কহিবেন। আপনি নিজে দাঁড়াইয়া অর্ডার দিয়া এই সব করান নাই?"

কথা শুনিয়া আমরা বুঝিলাম, ইহাদের নষ্ট সাহস ফিরিয়া আসিতেছে, কিন্তু মাতব্বর মহাশয় একেবারে রাগিয়া ফাটিয়া পড়িলেন। তবে তাহাতে কিছু হইল না। প্রতিবাদকারী বৃদ্ধও হটিবার পাত্র নহেন। অতএব তখনকার মত হার স্বীকার করিয়াই ব্যাপারটা চাপা দিতে হইল। এই মাতব্বর মহাশয়ের নামে অভিযোগ অনেক এবং অভিযোগ গুরুতর। কর্তব্যপালনে উৎসাহী জনৈক পুলিশ অফিসার সাহসী হইয়া ইহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছিলেন। গ্রেপ্তারের সংবাদ পাওয়া মাত্র অকুস্থলে শাসকমহলের অষ্টবজ্র-সম্মেলন বসিয়া গেল- দিগ্বিদিক হইতে দিকপালগণ ছুটিয়া আসিলেন। মাতব্বর জামিনে খালাস হইলেন, পুলিশ অফিসার বেচারা স্থানান্তরিত হইল।

অত্যাচারের জন্য প্রতিবেশীরাই যে দায়ী, তাহার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। বেগমগঞ্জ থানার কোনো গ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের পুরুষগণ নিহত হন এবং গৃহটি বিধ্বস্ত ও দগ্ধ করা হয়। ইহার পর পরিবারের স্ত্রীলোকেরা পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর গৃহে নীত হয়। প্রতিবেশীটি উৎপীড়ক সম্প্রদায়ভুক্ত। রটনা হইল স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উৎপীড়িত সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ধান লইলে দেখা যায় যে, ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। এই সম্পন্ন ও সুবিখ্যাত ধনী পরিবারের বিধ্বস্ত গৃহ হইতে লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া ভাঙ্গা হয়। কিন্তু অবস্থা অনুপাতে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া উচিত ছিল সে পরিমাণ পাওয়া যায় নাই। এই অবস্থায় গুপ্ত অর্থের সন্ধানলাভের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দিবার নামে আটক করিয়া নানাপ্রকারে নির্যাতন করা হয়। এই নির্যাতন-কাহিনী বর্ণনা অপেক্ষা অনুমান করাই শ্রেয়ঃ! সাতদিন পর্যন্ত নির্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে স্ত্রীলোকেরা গুপ্ত অর্থের সন্ধান দেয়। বস্তুতঃ দেখাও গেল, প্রত্যেক ঘরে মেঝের মধ্যে একটি ভূগর্ভস্থ ছোটো চৌবাচ্চা উদঘাটিত হইয়াছে। উপদ্রুত সকল অঞ্চলেরই এই এক ইতিহাস। উপদ্রব যাহা হইয়াছে উপদ্রুত সমাজের প্রতিবেশীরাই উৎপীড়ক হইয়া তাহা ঘটাইয়াছে। বাহিরের লোকের আবির্ভাব ও অভিযান—একেবারেই কাহিনী এবং একেবারেই কল্পনা। স্থানীয় লোকেরা ইহা করিয়াছে এবং যেভাবে করিয়াছে তাহাতে মনে হয়, ইহারা ধরিয়া লইয়াছিল, ইহাদের কার্যে শাসকগণের দিক হইতে বাধা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

নবেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা যখন দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম, তখন নিশ্চয়ই উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরে বহিরাগত গুণ্ডা ছিল না। কিন্তু তখনও অবস্থা স্বাভাবিক হয় নাই। উপদ্রব চলিতেছে। উদ্বাস্তুগণের মধ্যে কেহ কেহ পরিত্যক্ত গৃহ দেখিতে গিয়া গুম হইয়াছে;— পরে তাহার মুণ্ডহীন শব পাওয়া গিয়াছে। মিলিটারী ও পুলিশের সাহায্য ছাড়া কেহ অভ্যন্তরে যাইতে সাহসী হইতেছে না। আমরা মিলিটারী বা পুলিশের সাহায্য চাহি নাই, চাহিতে প্রস্তুত ছিলাম না। পরে জানিতে পারি, আমাদের হইয়া অপর কেহ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাহায্য চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি গাড়ীতে করিয়া ২/৩ জনকে রামগঞ্জ ঘুরাইয়া আনিতে পারেন। আমরা সরকারী-সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া ভ্রমণ করিয়াছি—প্রথম দিকে এক সঙ্গে ১৮/১৯ জন, পরে এক সঙ্গে ১৪/১৫ জন। দলের জনসংখ্যা ছাড়াও সামরিক পরিচ্ছদ পরিহিত আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের উপস্থিতি যে আমাদের নিরাপত্তা বিধানে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎসত্ত্বেও রামগঞ্জ যাইবার পথে রাত্রি হইয়া পড়িলে

স্থানে স্থানে গাড়ী হইতে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে শঙ্কার কারণের প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব অনুভব না করিয়া পারি নাই। আমিষাপাড়া যাইবার দিনই ইহা অনুভব করি। পথেই বুঝিতে পারিলাম নৌকার উপর নজর রাখা হইতেছে, নৌকার সাথে সাথে খালধার দিয়া দ্রুতবেগে লোক চলিতেছে। কিছুদূর যাইবার পর আমরা অনেকে নৌকা হইতে নামিয়া অপর পাড় ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এক জায়গায় আসিয়া দেখা গেল বিপরীত কূলে একটি সাঁকোর মুখে বহুলোক জড় হইয়া আছে এবং আমাদের লক্ষ্য করিতেছে। আমরা সেখানে পৌঁছিবামাত্র তাহারা দ্রুতবেগে সাঁকো পার হইয়া আসিয়া আমাদের পিছু লইল। এইভাবে কিছুদূর চলিবার পর আমরা নৌকাগুলিতে নামিয়া গেলাম তাহারা আরও কিছুদূর চলিয়া অদৃশ্য হইল।

চৌমুহনী হইতে রামগঞ্জ যাইতে যতক্ষণ দিনের আলো ছিল পথ একেবারে জনশূন্য বলিলেই হয়। অন্ধকার হইতেই দেখিলাম বেশ লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে মিলিটারী ইউনিফর্ম্ম-পরা লোক দেখা যাইতেছে। দীর্ঘপথ, মধ্যে মধ্যে খণ্ডিত; গাড়ীগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এক একজায়গায় দূর হইতে লক্ষ্য করিলাম, এইভাবে বিচ্ছিন্ন শেষের গাড়ীটী লক্ষ্য করিয়া পথের পাশে লোক আসিয়া দল বাঁধিতেছে; বিপদের প্রত্যক্ষ সম্ভাবনা অনুভব করিয়াছিলাম। কিন্তু গাড়ী যথেষ্ট দ্রুতবেগে চলিতেছিল। কিছু ঘটে নাই।

ইহা ২৩শে নবেম্বরের ঘটনা। ইতিপূর্ব্বে নোয়াখালির অবস্থা তদন্তের জন্য বাঙলা গবর্ণমেন্টের প্রেরিত সিভিলিয়ান অফিসার (রঞ্জিত গুপ্ত, আই. সি. এস. ২রা নভেম্বর রাত্রিতে উপদ্রুত, অঞ্চল হইতে একটি পরিবারকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছিলেন, পথে দলবদ্ধ দুর্বৃত্তগণ তিনবার তাহাকে আক্রমণ করে এবং প্রত্যেকবার গুলী চালাইয়া তিনি রক্ষা পান। রামগঞ্জ থানার দত্তপাড়ার নিকটে ইহা ঘটে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত উদ্ধারপ্রাপ্তদিগকে দত্তপাড়ার সাহায্যকেন্দ্রে লইয়া আসিতেছিলেন।) এই অঞ্চলেই সন্ধ্যার পর স্থানীয় জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

প্যানিকের দায়িত্বঃ

গবর্ণমেন্ট যাহাকে "প্যানিক" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ অকারণ নহে। তাহা সকারণ এবং সে কারণের মূল এইখানে। বহিরাগত নহে, গুণ্ডা নহে, "প্যানিকের" কারণ উপদ্রবকারী প্রতিবেশী। যাহারা বস্তুতঃ উপদ্রুত হয় নাই, তাহারাও যে ঘরদুয়ার ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহার কারণ তাহারা জানে, উপদ্রবকারীরা নিকটেই বর্তমান রহিয়াছে। আজ একজনের উপরে যাহা ঘটিয়াছে, কাল অপর কাহারও উপর তাহা সহজেই সংঘটিত হইতে পারে। উপদ্রবকারীরা বাহিরের লোক হইলে বা মাত্র গুণ্ডা হইলে এই মনোভাব প্রসারলাভ করিতে পারিত না। "প্যানিক" যে যাইতেছে না তাহার কারণ উপদ্রবকারী প্রতিবেশীদের নিরঙ্কুশ প্রভাব এবং সেই প্রভাব দমনে গবর্ণমেন্টের বিমুখতা। বিশেষ-বিস্ময়ের এবং বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই, উপদ্রবের পর যে সকল অপরাধী আত্মগোপন করিয়াছিল; মন্ত্রীদের ক্রমাগত যাতায়াতের ফলে তাহারা গ্রেপ্তার না হইয়া বরং গোপনতা পরিহার করিয়া চলিবার সাহস পাইয়াছে। সুতরাং "প্যানিক" না কমিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে। বহিরাগত গুণ্ডার উপর সমস্ত দায় চাপাইয়া বাহিরের লোকের চক্ষে ধূলা নিক্ষেপ করা যায়। কিন্তু উপদ্রুতেরা তাহাতে বিভ্রান্ত হইবে কেন?

(৩০, ১২, ৪৬)

নবম অধ্যায়ঃ

আতঙ্ক-প্রশমন ও পুনর্বসতিঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উৎখাত জনমণ্ডলীর যে সঙ্গত ও স-কারণ আতঙ্ককে মন্ত্রিগণ এবং অন্যান্য গভর্ণমেন্টপক্ষীয়গণ "প্যানিক" বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, সে আতঙ্ক দ্রুত প্রশমিত করিবার একটিমাত্র উপায় ছিল। নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া বিহারে আত্মপ্রকাশ করিলে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল যে ভাষায় বিহারবাসীদিগের সহিত কথা কহিয়াছিলেন লীগের নায়কগণ ও গবর্ণমেন্টের মুখপাত্রগণ যদি নোয়াখালির উপদ্রবকারীদিগের প্রতি সেই কঠোর তিরস্কার প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে উপদ্রুত ও উৎখাতগণের আতঙ্ক একদিনে প্রশমিত হইত এবং তাহারা স্ব স্ব আবাসে ফিরিতে উৎসাহিত হইত। কিন্তু তিরস্কারের পরিবর্তে লীগ নায়কদের মুখে, সরকারী মুখপাত্রদের মুখে উপদ্রবকারীদের সম্বন্ধে যে ভাষা শোনা গিয়াছে তাহা অনুগ্রহের ভাষা ও দরদের ভাষা। মুসলিম লীগের কায়েদে আজম (জিন্না) আজ পর্যন্ত নোয়াখালির নামটা মুখ দিয়া উচ্চারণ করেন নাই। মুসলিম লীগের সৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে গান্ধীজী বা জওহরলালের মনোভাবের প্রত্যাশা অসম্ভব-কল্পনা তাহা জানি। কিন্তু এই মনোভাব দেখাইতে না পারিলে লোকের বিশ্বাস ফিরিবে না।

মন্ত্রীদের কার্যে আতঙ্কবৃদ্ধিঃ

পক্ষান্তরে নোয়াখালির প্রতিনিধি অন্যতম মন্ত্রী মৌলবী গফরাণ এবং প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং এক একবার গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আতঙ্ক বাড়িয়াছে—আতঙ্কগ্রস্ত জনতার বহির্মুখী গতি বাড়িয়াছে। উপদ্রব ঘটাইবার দায়িত্ব এড়াইতে কোন যুক্তির আশ্রয় লইতে হইবে এবং উপদ্রবের সমস্ত দায়িত্ব কিভাবে বহিরাগতের উপর চাপাইয়া দিতে হইবে মৌলবী গফরাণের প্রথম দিককার বক্তৃতা হইতে লোকে তাহাই মাত্র বুঝিয়া লইয়াছে। পরবর্তী দফায় মন্ত্রীরা যে সকল প্রচারকার্য করিয়াছেন, তাহার সবগুলি হইতে উপদ্রবকারীরা নিম্নলিখিত রূপ বুঝিয়াছে—মিলিটারী আর বসিবে না, যাহা বসিয়াছে তাহা উঠাইয়া নেওয়া হইবে, বিশেষতঃ হিন্দু ও শিখ বাহিনী তো উঠাইয়া নেওয়া হইবেই; গ্রেপ্তার আর হইবে না, তল্লাসী বন্ধ করা হইবে; গ্রেপ্তার যাহারা হইয়াছে তাহারা জামিনে খালাস পাইবে; তাহাদের পরিবারবর্গ সাহায্য পাইবে এবং মুসলিম লীগ হইতে তাহাদের মামলা চালাইবার খরচ দেওয়া হইবে। যে সময়ে উপদ্রুত অঞ্চলে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঘন ঘন মিলিটারী সন্নিবেশ আবশ্যক সেই সময়ে উপদ্রবকারীদের মধ্যে এই ধারণা প্রচারের ফলে উপদ্রুতগণের মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপদ্রবের অব্যবহিত পরে কলিকাতা হইতে নোয়াখালি যাইবার পথে ১৪ই অক্টোবর তারিখে লাকসাম ষ্টেশনেই মৌলবী গফরাণের এই প্রচারকার্যের সূচনা দেখা যায়। লাকসাম ষ্টেশনে যাহাদের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতে জানা যায়, উপদ্রবের ক্ষেত্রে পৌছিবার পূর্বে উক্ত ষ্টেশনেই তিনি প্রচার করেনঃ—

(১) উপদ্রবের বিবরণ অতিরঞ্জিত

(২) যাহা ঘটিয়াছে বাহিরের লোকেরাই করিয়াছে

(৩) মুসলিম লীগের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

ইহার পর মৌলবী গফরাণের সহিত যাহারা নোয়াখালির অভ্যন্তরভাগে ঘুরিয়াছেন, তাহাদের সাক্ষ্যেও ইহাই সমর্থিত হয়। ঢাকার অধ্যাপক শ্রীসমর গুহের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইহা অক্টোবরের ঘটনা। নবেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা যখন গিয়া পৌঁছাই তাহার অল্প পূর্বে বেগমগঞ্জ থানার অধীন আমিষাপাড়া গ্রামের ঈদ-ময়দানে মৌলবী গফরাণের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। আমিষাপাড়া পরিদর্শনে গিয়া উক্ত সভার যে বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহা সংক্ষেপে এইরূপ :—

সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যতম মন্ত্রী মোঃ আহম্মদ হোসেন, মোঃ ফজলুর রহমান এমএল-এ, ফেনীর উগ্র লীগ বক্তা মোঃ আবদুল জব্বর খদ্দর, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, জনৈক মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড প্রভৃতি। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডটি বলিলেন,—"বাঙলা গবর্ণমেন্ট আমাদের গবর্ণমেন্ট, নোয়াখালিতে আমরা মিলিটারী চাহি না তথাপি আমাদের অর্থ তজ্জন্য ব্যয় করা হইতেছে। অবিলম্বে মিলিটারী উঠাইয়া লওয়া হউক।"

সভায় প্রশ্ন করা হইল, সকলেই মিলিটারী উঠাইয়া লওয়া সমর্থন করেন কি না—জবাব আসিল "হ্যাঁ, হাঁ।"

ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট মহাশয় বলিলেন,—হিন্দুরা যদি পুলিশে এজাহার দেওয়া বন্ধ না করে, তাহা হইলে তাহার ইউনিয়নে হিন্দুরা কোনো সাহায্য পাইবে না। মৌলবী খদ্দর বলিলেন—মন্ত্রীরা যদি অবিলম্বে মিলিটারী উঠাইয়া না লন, তাহা হইলে গুরুতর কাণ্ড ঘটিবে; সভাপতি মৌলবী গফরাণ ইহাদের সকলকে তাহার সহিত প্রাইভেটে সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন; বলিলেন, ধৃতগণের মামলা মুসলিম লীগ চালাইবে। — যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের জামিনের ব্যবস্থা তিনি করিবেন ইত্যাদি।

উপদ্রুত হইবার পর আমিষাপাড়া অঞ্চলে যে কয় ঘর হিন্দু তখনও বুক বাঁধিয়া ছিল, এই সকল বক্তৃতার দাপটে পরদিনই তাহারা স্থানত্যাগ করিল।

একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। উপদ্রুত অঞ্চলে প্রধান মন্ত্রী ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ জনসভায় যে সকল বক্তৃতা, আলোচনা ও উক্তি করিয়াছেন, তাহা সংগৃহীত হইলে অপূর্ব শিক্ষণীয় বিষয় হইত।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে একটা বিষয় বিশেষ স্পষ্ট হইবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে যাহাতে পুলিশের নিকট কোনো এজাহার না যায় তজ্জন্য বিশেষভাবে ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে। উপদ্রুত হইয়া যাহারা হটিয়া গিয়াছে তাহাদের পক্ষে এজাহার দিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহারাও ভীতি প্রদর্শনের চাপে এজাহার দিতে অগ্রসর হইতেছে না। পরিভ্রমণের সময় ইহা আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এজাহার দিতে দেওয়া দূরে থাকুক, অপরাধীরা কোনো প্রকারে গ্রেপ্তার হইলে উপদ্রবকারী ও তাহার দলবল উপদ্রুতদিগকেই অপরাধীদের জামিন হইতে বাধ্য করিয়াছে। এরূপ ঘটনা অনেক মিলিবে। চাঁদপুরে দুইজন মুসলমান মহকুমা হাকিমের নিকট জামিনপ্রাপ্ত ৩৯৯ জন অপরাধীর জামিন নাকচ করিয়া কুমিল্লার জেলাজজ গত ৩রা জানুয়ারী যে রায় দিয়াছেন, তাহাতেই এইরূপ ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর আচরণঃ

মিলিটারীর প্রতি বিরাগ এবং মিলিটারী বসানোর বিরুদ্ধতা মন্ত্রীদের বক্তৃতার এবং মন্ত্রীদের সভায় আলোচনার একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী এ বিষয়ে সকলের উর্দ্ধে। রামগঞ্জে ও কাজিরখিলে তাহার শেষ বক্তৃতা (১৭ই নবেম্বর) যাহারা শুনিয়াছে, তাহারা সকলেই একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিবে। শেষোক্ত সভায় মিঃ সুরাবর্দী নিজেই মিলিটারীর বিরুদ্ধে অভিযোক্তা হইয়া দাঁড়ান এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া প্রেস রিপোর্টারদিগকে ডাকিয়া মিলিটারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়া লইতে বলেন। অভিযোগে যতটা হউক, মিঃ সুরাবর্দীর চীৎকারে রিপোর্টাররা বিস্মিত হইয়াছিলেন।

তিনি গান্ধীজীর নিকট প্রকাশ্যভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করেন যে, অমুসলমান মিলিটারীরা কয়েকটি মুসলমান স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ গান্ধীজীর নির্দেশে ডাঃ সুশীল নায়ার স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান, অভিযোগ মিথ্যা। সুরাবর্দী মহাশয় বাঙলা না জানিবার ভাণ করেন। কিন্তু রামগঞ্জে মুসলমান জনতার নিকট বক্তৃতায় তাহার "খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।" মিলিটারীর অত্যাচারের সংবাদে বেদনা পাইয়াই যে তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন ইহা সরাসরি বুঝাইবার জন্য তিনি অপূর্ব্ব বাঙলাতেই বক্তৃতা জুড়িয়া দেন। ভাল কথা যে তিনি কিছুই বলেন নাই তাহা বলি না। কিন্তু সমস্ত বক্তৃতার মোট কথাটা হইল, আমি আছি আপনাদের ভয় নাই; মিলিটারী কিছু করিতে পারিবে না। মিলিটারী কিছু করিলে আমি তাহাদের সিধা করিয়া দিব।

রামগঞ্জের এই বক্তৃতাতে মিঃ সুরাবর্দী এক নূতন মতবাদ প্রচার করেন যে, হিন্দুরা এই সকল অঞ্চলে মুসলমান শাসনের অধীনেই বাস করিতেছে; সুতরাং মুসলমানেরা যেন তাহাদের উপর অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের নিরাপদে থাকিতে দেয়। বাঙলায় মুসলমান ও হিন্দু উভয়েই বাঙলা গবর্ণমেন্টের অধীনে বাস করে ইহাই এতদিন জানা ছিল। কিন্তু ১৭ই নবেম্বর তারিখে রামগঞ্জে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা যাহারা শুনিয়াছে তাহারা বুঝিয়াছে, বর্তমান আমলে বাঙলার হিন্দুরা ডবল শাসনে বাস করে এবং ইহার মধ্যে মুসলমান শাসনটাই প্রত্যক্ষ, সক্রিয় ও প্রবলতর। প্রধান মন্ত্রীর এই অপূর্ব অভিমত আতঙ্ক-প্রশমনের সহায় না অন্তরায় হইয়াছে, সে বিষয়ে মিঃ সুরাবর্দীর অন্ততঃ কোনো সন্দেহ নাই বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের আর যতই দোষ থাকুক তিনি যে অতিরিক্ত লজ্জাশীল বা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশে সঙ্কুচিত, একথা কেহ নিশ্চয়ই বলিবেন না। কিন্তু রামগঞ্জে এই বক্তৃতার পর তাহার পক্ষীয়গণ প্রেস রিপোর্টারদের বলিয়া দেন যে, তাহারা যেন তাহার বক্তৃতার রিপোর্ট পাঠাইবার চেষ্টা না করেন। কারণ টেলিগ্রাম অফিসে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বক্তৃতার কোনো রিপোর্ট টেলিগ্রাম করিবে না। বক্তৃতার রিপোর্ট যাহা দেওয়া দরকার, কলিকাতায় গিয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য, প্রধানমন্ত্রী মহাশয়ের এ বক্তৃতার সঠিক রিপোর্ট সংবাদ পত্রে পৌঁছায় নাই। ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমরা ইহা সবিশেষ জানিতে পারি।

উপদ্রবকারী ও অপরাধীর প্রশ্রয়ঃ

উপদ্রব দমন ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য মিলিটারী নিয়োগ করিয়া যেখানে মন্ত্রীরাই তাহাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোক্তা হইয়া দাঁড়ান এবং উপদ্রবকারীদের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া তাহা জাহির করিয়া বেড়ান, সেখানে উপদ্রবকারীরা মিলিটারীকে কতখানি গ্রাহ্য করিবে এবং মিলিটারী উপদ্রব দমনে ও আতঙ্ক দূরীকরণে কতদূর সফলকাম হইবে তাহা সহজেই বোঝা যায়। মন্ত্রীদিগের এই শ্রেণীর প্রচারকার্যের প্রত্যক্ষ ফল হইয়াছে এই যে, লোকে মিলিটারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে প্ররোচিত হইয়াছে। মুসলিম লীগ মুখপাত্রগণের অভিযোগ এই যে, বিহারের উপদ্রবের পর উপদ্রবকারীদিগকে দমন ও শান্তিরক্ষার জন্য বিহার গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন না; কিন্তু বিহার গবর্নমেন্ট যাহা করিয়াছেন তাহার পরিচয়ও তো বাঙলার লীগ গবর্ণমেন্টের আচরণে পাওয়া যায়

নাই। উপদ্রব কারীদিগকে যাহাতে কাঠোর হস্তে দমন করা হয় তজ্জন্য বিহার গবর্ণমেন্টের চীফ সেক্রেটারী ৫ই নবেম্বর তারিখে টেলিগ্রাম করিয়া উপদ্রুত অঞ্চলের শাসনকর্মচারীদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেনঃ–

"The present time is so serious that in areas where murder and arson is widespread all mobs must be immediately and effectively dispersed and if necessary this must be done by opening fire. Government feel it their duty to emphasise that they will countenance no weakness on the part of their officers in giving effect to these instructions."

"বর্তমানের অবস্থা এমন সঙ্কটপূর্ণ যে, যে সকল স্থানে ব্যাপক হত্যা ও গৃহদাহ চলিতেছে, তথায় উপদ্রবকারীদের দ্রুত ও দৃঢ়ভাবে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে গুলী চালনার দ্বারাই ইহা করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট ইহা জানাইয়া দেওয়া কতব্য বোধ করেন যে, এই নির্দেশ কার্যে পরিণত করিতে স্থানীয় কর্মচারীদের কোনো শৈথিল্য তাহারা সহ্য করিবেন না।"

ইহার অনুরূপ বা ইহার কাছাকাছি কোনো ব্যবস্থা কি নোয়াখালি-ত্রিপুরা সম্বন্ধে বাঙলা গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে করা হইয়াছে? পক্ষান্তরে বাঙলার লীগ মন্ত্রীরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই ভাবই দেখাইয়া আসিয়াছেন যে, উপদ্রুত অঞ্চলে মিলিটারী তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতেই তাহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই; কার্যতঃ তাহারা যাহা করিয়াছেন তাহাতে উপদ্রব দমনে মিলিটারীর ইচ্ছানুযায়ী, ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধা সৃষ্টি হইয়াছে। ১৬ই আগষ্টের মুসলিম লীগের 'সংঘর্ষ দিবস' অনুষ্ঠানের ব্যাপার হইতে কলিকাতায় যে উপদ্রব আরম্ভ হয় সেই উপদ্রব ও উপদ্রবকারীদিগকে দমন করিতে গবর্ণমেন্টপক্ষের বিমুখতাকে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় আখ্যা দিয়াছিলেন "Softness for the goondas- গুণ্ডার প্রতি অতিরিক্ত দরদ"। নোয়াখালি-ত্রিপুরার ব্যাপারে সরকারপক্ষীয়গণের মনোভাব ও আচরণ যাহা দেখা গিয়াছে, তাহাতে শ্রীযুক্ত রায়ের মন্তব্য অধিকতর সঙ্গতির সহিত প্রযুক্ত হইতে পারে। পূর্বোল্লিখিত জামিন-নাকচের মামলায় কুমিল্লার জেলা জজ যে রায় দিয়াছেন তাহাতেই সরকারী কর্মচারীদের—অন্ততঃ এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের- গুণ্ডার প্রতি এই দরদ প্রমাণিত হইয়াছে। চাঁদপুরের অতিরিক্ত মহকুমা হাকিম মিঃ আতাওর রহমান এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলি যে ৫৩৮ জন অপরাধীকে জামিনে খালাস দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ৩৯৯ জনের জামিন নাকচ করিয়া জেলা জজ বলেনঃ–

"চাঁদপুরে চাহিবামাত্র জামিন দেওয়া হইয়াছে, যদিও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর—ডাকাতি, হত্যা, গৃহদাহ, ধর্ম্মনাশ, বলপূর্বক বিবাহ, ধর্ম্মস্থান কলুষিত করা এবং সতীত্বনাশ প্রভৃতি। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিবেচনানুযায়ী জামিন দিবার ক্ষমতা আছে সত্য। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে জামিন দেওয়া সে ক্ষমতার অপব্যবহার।"

সরকারী কর্মচারীদের অথবা তাহাদের একাংশের আচরণে ইহা এমনভাবে প্রকট হইয়াছে যে, চরম উপদ্রব সহ্য করিয়াও লোকে পুলিশে এজাহার দেয় নাই; কারণ এজাহার দিলেও উপদ্রবকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কিছু করিবে না, পরন্তু আক্রোশবশতঃ উপদ্রবকারীরা উৎপাতের মাত্রা আরও চড়াইয়া দিবে। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখনও সর্বত্র এই ভীতির রাজত্ব। বিশেষ করিয়া চরমণ্ডল অঞ্চলের উৎপীড়িত সমাজের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে ইহা জানিবার সুযোগলাভ করিয়াছিলাম। ইহা নিশ্চিত যে, নোয়াখালি-ত্রিপুরায় উপদ্রব যাহা হইয়াছে, তাহার তুলনায় পুলিশে এজাহার আসিয়াছে সামান্যই। লোকের সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে, উপদ্রুত অপেক্ষা উপদ্রবকারীদিগের প্রতিই শাসন কর্মচারী ও পুলিশ কর্মচারীদের সহানুভূতি সমধিক – উহাদের মধ্যে হিন্দু অংশ অক্ষম এবং মুসলমান অংশ আস্থা স্থাপনের অযোগ্য।

সরকারী ব্যবস্থায় লোকের অনাস্থাঃ

বস্তুতঃ সরকারের নীতিতে ও সরকারী কর্মচারীদের আচরণে লোকের আস্থা এমনভাবে নষ্ট হইয়াছিল যে, উপদ্রুত অঞ্চল হইতে দূরে অবস্থিত জেলার প্রধান সহর নোয়াখালি হইতেও উপদ্রুত সমাজভুক্ত বহু লোক সরিয়া যায়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, তখন পথের দুই পার্শ্বে বহু বাড়ী খালি হইয়া গিয়াছে। সন্ধান লইয়া জানা যায় যে, তখনও সহররক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই। সহরে রিজার্ভ ফোর্স রাখিবার জন্য এবং নিয়মিত পেট্রলের ব্যবস্থা করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও কর্তৃপক্ষ তাহা করেন নাই। ফলে আতঙ্কগ্রস্ত জনতা সহর ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে।

উপদ্রবের পর উপদ্রুত অঞ্চলে লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের গতিবিধি ও আচরণ আতঙ্ক প্রশমন ও পুনর্বসতি কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিয়াছে। স্থানীয় শাসন-কর্মচারীরা আদেশ জারী করিয়া রিলিফ স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের অবাধ যাতায়াতের ও নিরঙ্কুশ আচরণের সুযোগ দিয়াছেন। ২০শে নবেম্বর তারিখে চাঁদপুরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তি (শ্রীযুক্তা রেণুকা রায়) হাইমচর অঞ্চলে লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের এই শ্রেণীর আচরণ এবং কার্য্যকলাপের উল্লেখ করেন। তৎকালে ত্রিপুরা জেলার শাসন কর্মচারীরা রিলিফের কার্যে নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবকদিগকে অনুমতিপত্র ছাড়া উপদ্রুতদিগের সেবাকার্যে যাইতে দিতেছিলেন না। কিন্তু উক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিটি হাইমচরে লীগ স্বেচ্ছাসেবক দেখিতে পান এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন, তাহারা অনুমতিপত্র ছাড়াই তথায় যাইবার সুযোগ পাইয়াছে। তাহাদের তথায় উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কোনো সদুত্তর পান নাই। তাহাদের আসিবার যে কোনো কারণ বা প্রয়োজন নাই, ইহা তিনি বুঝাইয়া বলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বস্তুতঃ তিনি দেখিতে পান, লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের এইরূপ অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে উপদ্রুতদিগের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িতেছে এবং যাহাতে রিলিফের স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিতে বা কাজ করিতে সুবিধা না পায়, উহারা সেই শ্রেণীর প্রচারকার্য করিতেছে। ইহার পরদিন নোয়াখালিতে গিয়া লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের এই শ্রেণীর কার্য্য সম্বন্ধে পুনরায় আমরা সংবাদ পাই। ফরিদগঞ্জ অঞ্চলে আশ্রয়প্রার্থীদিগের সেবাকার্যে নিযুক্ত জনৈক ব্যক্তি উহা আমাদের গোচর করেন। রূপসা ও সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে উৎখাতগণের পুনর্ব্বসতির চেষ্টা হুইসিল ও ইউনিফর্ম্মে সজ্জিত মুসলিম লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুনঃপ্রত্যাগতদিগের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে স্থানীয় জনতাকে তাহারা যে সকল নির্দেশ দিয়াছে তাহা মোটেই আশ্বাসজনক নহে। একদিকে এই এবং অপরদিকে পুলিশ কর্তৃক তল্লাসীর চেষ্টায় সর্বতোভাবে বাধা দিতে হইবে, ইহাও ছিল তাহাদের বিশেষ নির্দেশ। বর্তমানে যখন উৎখাতগণের পুনঃপ্রত্যাবর্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের স্থানসমূহে মুসলিম ন্যাশন্যাল গার্ডের আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ইহা আশ্বাসের কথা নহে। স্থানীয় শাসনকর্তারা রিলিফের স্বেচ্ছাসেবকগণের যাতায়াতে যথাসম্ভব বাধা দিয়াছেন এবং তাহাদের পিতৃমাতৃকুলের পরিচয় লইয়া তবে যাইতে দিয়াছিলেন। তাঁহারা কি লীগ স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্প্রয়োজনে যাতায়াত নিষেধ করিতে পারেন না?

২৩শে নবেম্বর রাত্রিতে আমরা যখন মধুপুর রিলিফ ক্যাম্পে, সেই সময়ে জনৈক জাতীয়তাবাদী মুসলমান শ্রীযুক্ত বসুর সহিত সাক্ষাৎ, করেন। তাঁহার পোষাকে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তিনি স্পষ্টই শরৎবাবুকে জানাইলেন যে, স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় তাহাকে ছদ্মবেশেই আসিতে হইয়াছে। সঙ্গে একটি মাত্র বিশ্বস্ত সহচর। উপদ্রবের সময়ে তিনি বাহিরে ছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তাহার পরিচিত লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জের জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, কাটাকাটি ও লুটপাট করিয়া আখেরে বিশেষ লাভ হয় না - কিন্তু সুবিধা পান নাই। তিনি শরৎবাবুকে স্পষ্টই বলেন যে, স্থানীয় জনসাধারণের মনের অবস্থা তখনও ভাল নহে। পরদিন গান্ধীজীর সহিত আলোচনাপ্রসঙ্গে গান্ধীজী যখন বলেন যে, দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে অনুতাপের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তখন জাতীয়তাবাদী এই মুসলমান ভদ্রলোকটির কথা তাহার নিকটে নিবেদন করিয়াছিলাম।

ইহার পর এক মাসের অধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে। অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে আশা করি; কিন্তু কতটা ভাল হইয়াছে বলিতে পারি না। উপদ্রবের প্রথম প্লাবন থামিয়া যাওয়ার পরেও প্রকাশ্য হত্যা, গুপ্তহত্যা, জোর করিয়া ধান কাটিয়া লওয়া, লুণ্ঠন প্রভৃতি অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছে এবং এখনও সম্পূর্ণভাবে থামে নাই। এই অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ও পুনর্ব্বসতির চেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহাই ভাবিবার। অথচ লোক যাইতেছে। আশ্রয় নাই, আহার নাই এবং এই শীতে উপযুক্ত আচ্ছাদন নাই—কতটা ইহার জন্য বাধ্য হইয়া যাইতেছে এবং কতটা আগ্রহে যাইতেছে তাহা বলিতে পারি না। যে কারণেই ইহারা যাক, স্থানীয় অবস্থা বিশেষরূপে না দেখিয়া নারী, শিশু ও বৃদ্ধদিগকে সহসা লইয়া তথায় উপস্থিত করা যে কর্তব্য নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা উপদ্রব করিয়াছিল তাহারা এখনও তথায় বর্তমান। উপদ্রুতগণ পুনরায় তাহাদের মুঠার মধ্যে গিয়া পড়িলে তাহারা যে ইচ্ছানুযায়ী একরার করাইয়া লইতে চেষ্টা করিবে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। বিশেষতঃ যাহারা এজাহার দিয়াছে, তাহাদের উপর যে এইরূপ চাপ পড়িবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যেই কোন কোন স্থলে উপদ্রবকারীরা বলিয়াছে যে, কোনরূপ উপদ্রব হয় নাই ইহা লিখিয়া না দিলে প্রত্যাবর্তিতদিগকে থাকিতে দেওয়া হইবে না এবং কার্যতঃ তাহা লিখাইয়াও লইয়াছে। নোয়াখালি-ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী হাজিগঞ্জ থানার মধ্যে এক আশ্রয়কেন্দ্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সংবাদ হইতে বলিতে পারি এখনও তথাকার লোকে ফিরিতে চাহিতেছে না। পুরুষেরা মধ্যে মধ্যে গিয়া বাসগৃহ দেখিয়া আসিতেছে; কিন্তু স্ত্রীলোকদের লইয়া যাইতে পারিতেছে না, লইয়া যাইতে বলিলে হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছে।

গবর্ণমেন্টের কর্তব্যঃ

সমস্যার প্রতিকারের জন্য গান্ধীজী তাহার নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে যাহা করিতেছেন, তাহা মৌলিক চিকিৎসা। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও কর্তব্য আছে—বিশেষতঃ গবর্ণমেন্টের দিক হইতে। গবর্ণমেন্ট যদি সজাগ ও মনোযোগী হইতেন, তাহা হইলে প্রতিকার অনেক সহজসাধ্য হইত। ইহা নিশ্চিত যে, উপদ্রুত সমাজের স্মৃতি অপসারিত হইতে সময় লাগিবে। উপদ্রবের ধ্বংসস্তুপ অপসারণে যে সময় লাগিবে, স্মৃতি অপসারণে সময় লাগিবে ততোধিক। হত্যার স্মৃতি, নারীলাঞ্ছনার স্মৃতি, গৃহদাহের স্মৃতি, ধর্মনাশের স্মৃতি, লুণ্ঠনের স্মৃতি এবং তাহার পর উৎখাত অবস্থায় অসহনীয় ক্লেশের স্মৃতি যত দিন প্রখর থাকিবে ততদিন আশঙ্কা থাকিবে এবং আস্থা ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে। এই অবস্থায় গবর্ণমেন্টপক্ষের বিশেষ কর্তব্য, যতদিন আস্থা ফিরিয়া না আসে, ততদিন অধিকতর সতর্ক ও ব্যাপক প্রহরার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজন নোয়াখালি সহরে, চৌমুহনীতে, ফেণীতে এবং সম্ভব হইলে রামগঞ্জে টেলিফোনের সংযোগ স্থাপন করা। যুদ্ধের সময় নোয়াখালি জেলায় টেলিফোনের সংযোগ স্থাপিত করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। টেলিফোনের যোগ থাকিলে উপদ্রবের সংবাদ এমন করিয়া চাপা থাকিত না এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা এত বিলম্বিত হইত না। চৌমুহনীতে টেলিগ্রাম অফিস আছে। কিন্তু দেখিয়াছি, প্রেস টেলিগ্রাম পর্যন্ত তথায় ২৪ ঘন্টার অধিককাল আটক থাকিয়া যায়।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাম ছাড়া উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরে পুলিশের কেন্দ্র আরও বেশী করা প্রয়োজন। বিহার গবর্ণমেন্ট তথাকার উপদ্রুত অঞ্চলে ইহা করিয়াছেন। উপদ্রুতগণের ফিরিবার সূচনা দেখা যাইতেছে, এই সময়ে পূর্ব অপেক্ষাও কঠোরতর ব্যবস্থা প্রয়োজন, যাহাতে ফিরিবার পর ইহাদের উপর আর কোন উপদ্রব না হয়। পুনরায় উপদ্রুত হইলে, ইহাদের ভরসা একেবারেই ভাঙ্গিয়া যাইবে। গান্ধীজী অবশ্য পুলিশ বা মিলিটারীর মুখের দিকে চাহিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহার দিক হইতে ইহা সত্য। কিন্তু গবর্ণমেন্টের নিজের দিক হইতে কর্তব্য আছে। বিহারে উপদ্রুত মুসলমান সমাজের জন্য মুসলিম লীগ মুসলমান মিলিটারী ও মুসলমান পুলিশের বিশেষ নিয়োগ চাহিয়াছে। নোয়াখালি-

ত্রিপুরার উপদ্রুত হিন্দুসমাজও তেমনি নিশ্চয়ই হিন্দু এবং শিখ মিলিটারী ও পুলিশ চাহিতে পারেন। এই সময় অভ্যন্তর হইতে মিলিটারী উঠাইয়া না লইয়া আরও যথেষ্ট সময় রাখা উচিত ছিল। ঘটনা লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়, রামগঞ্জ থানার সাহাপুর অঞ্চলে উপদ্রবকারীদের প্রধান কেন্দ্র। গোলাম সারোয়ারের গৃহ ইহারই সন্নিকটে। এইজন্য সাহাপুর বাজারকে কেন্দ্র করিয়া চতুস্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নন্দীগ্রামে, আমকীতে, আনন্দীপুরে, আমিষাপাড়ায় আরও দীর্ঘকাল সতর্ক প্রহরা অত্যাবশ্যক। জেলার শাসনকর্তারা মিলিটারীর উপস্থিতির উপযুক্ত সুযোগ গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে অভিযোগ আমরা পাইয়াছিলাম, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের বিরুদ্ধে আরও বিশেষ অভিযোগ এই যে, যখন নেতৃস্থানীয় কেহ উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই তাঁহারা মিলিটারী সঙ্গে দিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ কর্মীরা চাহিয়াও তাঁহাদের নিকট হইতে মিলিটারীর সাহায্য পায় নাই।

No Compromise with Goondas:

শান্তি ও পুনর্ব্বসতি স্থাপন সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিদের সহিত শরৎচন্দ্রের যে সকল আলাপ হইয়াছে তাহার প্রত্যেক আলাপেই তিনি একটি নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—“no compromise with goondas.” – শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য যাহাদের দিক হইতে যে চেষ্টাই হউক, এই নীতিকে ক্ষুন্ন করা চলিবে না। প্রত্যক্ষ আলাপে শরৎচন্দ্রের নির্দিষ্ট এই নীতির বিরুদ্ধে কাহাকেও কোনো আপত্তি করিতে দেখি নাই—সকলেই ইহার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়াছেন এবং একবাক্যে ইহা মানিয়া লইয়াছেন। আজ যখন পুনর্ব্বসতি আরম্ভ হইতেছে তখন এই কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বোধ, করি। স্থানীয় লোকেরা উপদ্রবকারীদিগের উপযুক্ত দণ্ডবিধানের জন্য কতখানি অগ্রসর হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত হইবে, তাহারা প্রকৃত শান্তির জন্য কতখানি আগ্রহী। মোট কথা, শান্তি স্থাপনের নামে উপদ্রবকারীদিগকে অব্যাহতি দিবার যে দৃষ্টান্ত পাবনায় (১৯২৬, জুলাই) ও ঢাকায় (১৯৪১, এপ্রিল) সাম্প্রদায়িক আক্রমণের পর দেখা গিয়াছে, নোয়াখালিতে যেন সে দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

ধ্বংসের পূর্বে হিন্দুপরিবারসমূহ যে যেখানে ছিল, পুনর্ব্বসতির সময়ে তাহারা যদি তথায় গিয়া বাস করিতে না চায়; তাহা হইলে তাহাদের দুই দিক দিয়া সাহায্য প্রয়োজন হইবে—প্রথমতঃ তাহাদের অভিপ্রায়ানুরূপ বাসস্থান সংগ্রহ করিয়া লইবার সুযোগ দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ পুরাতন বাস ত্যাগ করিয়া তাহারা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। যদি কেহ পুরাতন বাসভূমি আপনাদের অধিকারে রাখিতে না চাহে, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টকেই ন্যায্য মূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া লইতে বলিব। তাহা না হইলে উপদ্রবকারী প্রতিবেশীদের নিকট যদি উহা বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিতে হয় তাহা হইলে উপদ্রবকারীদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বটে কিন্তু উপদ্রুতগণ ন্যায্য মূল্য পাইবে না। গবর্ণমেন্ট ‘ফ্লাউড কমিশনের’ সুপারিশ কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। নোয়াখালিতে উৎখাতগণ, যথায় যথায় জমিতে আপনাদের স্বার্থ বিক্রয় করিতে চাহিবে, গবর্ণমেন্ট উপযুক্ত মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লউন। ইহা ছাড়া উপদ্রুতগণের নিকট হইতে ভূমিরাজস্ব, শিক্ষা, রোড-সেস প্রভৃতি আদায় আপাততঃ বর্তমান বৎসরের জন্য স্থগিত করাও প্রয়োজন। বিহার গবর্ণমেন্ট বিশেষ নির্দেশ জারী করিয়া উপদ্রুত অঞ্চলে রাজস্ব-নীলাম স্থগিত করিয়াছেন।

বৃহত্তর হিন্দু সমাজের কর্তব্যঃ

স্থানত্যাগের সময়ে নোয়াখালি-ত্রিপুরার উৎখাতগণ যেরূপ অনিশ্চিত ও অনিয়ন্ত্রিতভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, পুনর্ব্বসতির সময় তাহারা পুনরায় সেইরূপ বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়া না পড়ে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিক্ষিপ্তভাবে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্ব্বসতি স্থাপন করিলে তাহার উদ্দেশ্যই

পণ্ড হইবে। পুনরায় সহজেই বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে। অনেকের পক্ষে পূর্বেকার ভিটায় বা পূর্বেকার গ্রামে বাস সম্ভব নাও হইতে পারে। সেক্ষেত্রে নূতন গৃহ এবং নূতন গ্রামের সন্ধান বা পত্তন করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন পূর্ব্ব-পরিকল্পনা, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও ধারাবাহিক কার্যক্রম। অতীত ও বর্তমানের প্রতি অবহিত হইয়া এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুনর্বসতির পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করিতে হইলে নোয়াখালি-ত্রিপুরার স্থানীয় নেতৃবৃন্দের এবং বাঙলার বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দের এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস করিতে হইবে। হিন্দুসমাজ নোয়াখালি ত্যাগ করিতে পারে না; ইহা যেমন সত্য, যে অবস্থায় ছিল ঠিক সেই অবস্থার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না, ইহাও তেমনি সত্য। এই উভয়ের মধ্যে পথ ও কর্তব্য নির্দেশ করিতে হইলে আস্থাভাজন নেতাদের কিছুকাল নোয়াখালি অঞ্চলে থাকা প্রয়োজন, - মাত্র যাতায়াত যথেষ্ট নহে। যাতায়াতের যে উপযোগিতা নাই তাহা বলিতেছি না, প্রথম দিকে যাতায়াতের প্রয়োজন যথেষ্টই ছিল। যাতায়াতের ফলেই অবরুদ্ধ অঞ্চলসমূহ সহজগম্য হইয়াছে; উপদ্রুত ও অবরুদ্ধদিগের মধ্যে যে অদ্ভুত অসহায়তা দেখা দিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে; সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন ও বর্জ্জিত বলিয়া উপদ্রুতগণের মনে যে ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল এবং যাহা আরও বাড়িলে তাহারা হয়তো অত্যাচারীদের নিকটেই আত্মসমর্পণ করিত, সেই ভাব অপসারিত হইয়াছে—সাহস ফিরিয়াছে, বৃহত্তর সমাজের সহিত আত্মীয়তার সম্বন্ধ তাহারা অনুভব করিয়াছে; তথাকথিত ধর্ম্মান্তর সত্ত্বেও সমাজ যে তাহাদিগকে ফেলিয়া দেয় নাই এই উপলব্ধিতে সাহস আসিয়াছে—চিত্তগ্লানি ঘুচিয়াছে। চর হাইম বা চর মণ্ডলে আমরা যখন গিয়াছি তখন লোকের সাহস ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সময় তাহারা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ ও বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল; তৎকালীন অবস্থার কল্পনাও এখন দুঃসহ। এখন ধর্মান্তরের কথা উঠিলে উপদ্রুতেরা হাসিয়া উড়াইয়া দেয় এবং যাহারা ধর্মান্তর করিয়াছিল তাহারাই বেকুব হয়। অনেক স্থলেই ইহা দেখা গিয়াছে। সে হিসাবে যাতায়াত যাহা হইয়াছে এবং যত হয় ততই ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু যাতায়াতের এই উপযোগিতারও একটি সীমা আছে। স্থায়ী প্রতিকারের পথ এবং স্থায়ী পুনর্গঠনের পথ গান্ধীজীর পথ। জেলার মধ্যে থাকিয়া পথ দেখাইতে হইবে, বাহির হইতে পরামর্শ দান যথেষ্ট নহে।

নোয়াখালির সমস্যাটাকে মাত্র পুনর্বসতির সমস্যা বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। নোয়াখালিতে হিন্দুসমাজ নূতন করিয়া গড়িতে হইবে, নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্ব যাহাদের হাতে ছিল সেই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পূর্ণই উৎসন্ন হইয়াছে, তাহারাই ছিল আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল; শিক্ষিত, অর্থবান ও অভিজাত—হিন্দুসমাজের এই প্রধান তিনটা অংশকে ধ্বংস করিবার জন্য ব্যাপক আক্রমণ উদ্যত হইয়াছিল এবং তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণী ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী এখনও টিকিয়া আছে। তাহাদের মধ্য হইতেই নূতন নেতৃত্বের সন্ধান ও সৃষ্টি করিতে হইবে। ধ্বংসের মধ্য হইতে নূতন সমাজ সৃষ্টির ও প্রতিষ্ঠার সাধনায় গান্ধীজী ব্রতী হইয়াছেন। একদিকে অত্যাচারপ্রবৃত্তি এবং অপর দিকে ভয়— মনুষ্যপ্রকৃতির এই মূলগত ব্যাধির মৌলিক চিকিৎসার কার্যে তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাকে সাফল্যদান করিতে হইলে বাঙলার হিন্দুসমাজের নেতাদের মধ্য হইতেও এই কার্য্যে গান্ধীজীর ন্যায় অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া আত্মনিয়োগ প্রয়োজন।

(৮. ১. ৪৭)

দশম অধ্যায়ঃ

অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের সমস্যাঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরায় উপদ্রবজনিত সমস্যাসমূহের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসহ এবং যাহার প্রতিকার সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য তাহা হইল অপহৃতা নারীদের উদ্ধার-সমস্যা। উপদ্রবকারীদের দ্বারা যে সকল অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহার মত মর্মান্তিক আর কিছুই নাই। অথচ ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা বা উপায় এখনো পর্যন্ত হয় নাই। উপদ্রুত অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহার মধ্যে এই দুঃসহ সমস্যার কোথাও উল্লেখ দেখিতেছি না। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গান্ধীজীর পরিক্রমার মধ্যেও অপহৃতা ও নিগৃহীতাদের প্রসঙ্গ কোথাও উত্থাপিত হইতেছে না। ১৮ই জানুয়ারী বদলকোটে প্রার্থনান্তিক সভায় গান্ধীজী উপদ্রবকারীদের যে সকল অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে লুণ্ঠন, গৃহদাহ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরের উল্লেখ দেখিতেছি, কিন্তু অপহৃতা নারীদের কথা নাই। ১৬ই জানুয়ারী নারায়ণপুরের প্রার্থনান্তিক সভায় মুসলমান প্রশ্নকারীদের উত্তরদান প্রসঙ্গে মহাত্মাজী লুণ্ঠিত সম্পত্তি পুনঃ প্রত্যর্পণের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু অপহৃতা নারীদের পুনঃ প্রত্যর্পণের কথা দেখিতেছি না। এই প্রশ্ন উত্থাপনে নানাদিক দিয়া সঙ্কোচের (delicate) বিষয় আছে, স্বীকার করি। কিন্তু ইহা না উত্থাপন করিলেই বা মীমাংসা কেমন করিয়া হইবে? অপহৃতা ও নিগৃহীতাদের বেদনার আর্তস্বর কি চিরকালের জন্য চাপা পড়িয়া যাইবে?

উদ্ধার-সমস্যার দুঃসাধ্যতাঃ

উপদ্রবের প্রথমদিকে উপদ্রুত অঞ্চলে উদ্ধার-সমস্যা দেখা দিয়াছিল, দুই দিক দিয়া—

(১) বিপদসঙ্কুল অঞ্চলে অবরুদ্ধ জনতার উদ্ধার ও নিরাপদ স্থানে তাহাদের অপসারণ

(২) অপহৃতা ও নিগৃহীতা নারীদের সন্ধান ও উদ্ধারসাধন।

সমস্যার প্রথম অংশের প্রতিকার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল এবং এতদিনে তাহা মিটিয়া গিয়াছে আশা করি। কিন্তু অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের যে দুঃসহ ও দুঃসাধ্য সমস্যা, তাহার প্রতিকার হয় নাই; প্রতিকারের জন্য বে-সরকারী প্রয়াস কিছু কিছু হইলেও গবর্ণমেন্টের দিক হইতে কোন চেষ্টাই হয় নাই এবং যত দিন যাইতেছে, প্রতিকারের সম্ভাবনা যেন তত দূরে সরিয়া যাইতেছে। অবস্থা দেখিয়া আশঙ্কা হয়, উপদ্রবজনিত অন্যান্য সমস্যার অল্পাধিক প্রতিকার সম্ভব হইলেও অপহৃতা-উদ্ধারের সমস্যার শেষ পর্যন্ত বিশেষ কোনই প্রতিকার হইবে না। অপহৃতারা শেষ পর্যন্ত হয়তো দুর্বৃত্তদের কবলেই থাকিয়া যাইবে। শ্রীযুক্ত সুচেতা কৃপালনীর নোয়াখালিতে যাইবার প্রথম দিকে কিছু কিছু উদ্ধারের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পর গত ৩১শে ডিসেম্বর বেগমগঞ্জ থানার এলাকাধীন একটি গ্রাম হইতে উপদ্রুত সম্প্রদায়ের একটি অপহৃত যুবতীকে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃপালনী ১৫ই ডিসেম্বর নোয়াখালিতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাহার পরও দত্তপাড়ার সন্নিকটস্থ কোন গ্রামে অবস্থানকালে রাত্রিতে তাহার বাসস্থানে হানা দিবার যে ষড়যন্ত্র সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে, ["এলাহাবাদ ১০ই জানুয়ারী—অদ্য অপরাহ্নে কংগ্রেস

সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃপালনী সংবাদিকদের নিকট বলেন যে, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী দত্তপাড়ার নিকটবর্তী এক গ্রামে অবস্থান করিবার সময় কয়েকজন গুন্ডা তাহার কুটীরে হানা দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, কিন্তু সময়মত সতর্কতা অবলম্বন করায় তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। আচার্য কৃপালনী বলেন যে, তিনি তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে উক্ত ঘটনার বিবরণ-সম্বলিত এক পত্র পাইয়াছেন। পত্রের কথা উল্লেখ কয়িয়া শ্রীযুক্ত কৃপালনী বলেন যে, শ্রীযুক্তা কৃপালনী গুণ্ডাদের মতলব জানিবার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ও সৈন্যদের সংবাদ দেন। এইরূপে তাহার কুটীরে হানা দিবার ষড়যন্ত্র অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়।-এ, পি"। আনন্দবাজার পত্রিকা ১২.০১.৪৭] তাহা হইতে অবস্থার গুরুত্ব এবং সমস্যার প্রতিকারের দুঃসাধ্যতা প্রতিপাদিত হইবে। তবে, প্রতিকার দুঃসাধ্যই হউক, প্রতিকার কিছু হউক বা না হউক, অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের সমস্যা যে রহিয়া গেল সে-কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া এবং তৎসম্বন্ধে সকলকে সচেতন রাখা কর্তব্য বোধ করি। মহাত্মাজী যখন শান্তির বাণী বহন করিয়া এবং সম্প্রীতি প্রার্থনা করিয়া দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এই সমস্যার প্রতি সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ইহাই সুপ্রকৃষ্ট ক্ষণ। যাহারা বাস্তবিকপক্ষে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রয়াসী তাহাদের উদ্দেশ্য ও আন্তরিকতার একটা প্রমাণের কথা পূর্ব্ববর্তী নবম অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। তাহা এইঃ- অপরাধীদের সম্বন্ধে রাজদ্বারে যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা করিতে হইবে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও দৃঢ়তর ও প্রকৃষ্টতর প্রমাণ হইল অপহৃতা নারীদের প্রত্যর্পণ এবং স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে উদ্যোগী হইয়া তাহাদের সন্ধান ও উদ্ধারসাধন।

নারী-নির্যাতনঃ

অপহৃতা নারীদের উদ্ধার-সমস্যা আলোচনা প্রসঙ্গে নারীনির্যাতনের কথাটা উল্লেখ করিতে হইবে। অপহৃতাদের অদৃষ্টে কি ঘটিয়াছে, তাহা এখনও বাহিরের লোকের অগোচর। কিন্তু নারী-নির্যাতন-পর্বের অনেকটা লোকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে এবং সেই মর্মন্তুদ স্মৃতি ভুলিতে পারিতেছে না। যে সকল ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষদিগকেই এই নির্যাতন ঘটাইবার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষের আত্মগ্লানি ও মর্মবেদনা কি স্তরে আসিয়াছে, তাহা বলিবার নহে, কল্পনা করিবার। লোকচক্ষুর সম্মুখে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে নারী-নির্যাতনই সর্বাপেক্ষা গ্লানিকর এবং সর্বাপেক্ষা বেদনাজনক। এই উৎপীড়ন কেবল দেহের উপর নহে—মানুষের মনের যাহা সর্বাপেক্ষা সুকুমার বৃত্তি এবং জীবনের যে সকল কোমল সম্বন্ধ ও অনুভূতিকে মানুষ নিবিড়তম শ্রদ্ধা, প্রেম ও স্নেহের আবরণে মণ্ডিত করিয়া বাহিরের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা করে, এ উৎপীড়ন সেই সকল বৃত্তি, সম্বন্ধ ও অনুভূতির উপর; সেইজন্যই ইহা শারীরিক উৎপীড়ন অপেক্ষাও অধিকতর দুঃসহ। যে সমাজে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া অগণিত পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সংস্কার অনুসারে বিবাহিত নারীর সীমন্তের সিন্দুর ও প্রকোষ্ঠের মঙ্গলশঙ্খ স্বামীর আয়ুষ্মত্তা ও পরিবারের কল্যাণের সূচক সেই সমাজের বিবাহিতা নারীর সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়া দেওয়া (তাহাও পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা!) এবং তাহার মঙ্গলশঙ্খ ভাঙ্গিয়া দেওয়া শরীরের উপর বিশেষ অত্যাচার না হইলেও অন্তস্তম অনুভূতির উপর কি নিদারুণ অত্যাচার! এই সমাজ-গর্হিত কার্য্য যদি বিবাহিতার স্বামীকে দিয়াই করানো হয় তাহা হইলে অত্যাচারের প্রণালী ও প্রকৃতি কি রূপ পরিগ্রহ করে তাহাও বর্ণনা করিবার নহে, কল্পনা করিবার। জনৈক উৎপীড়িত স্বামী স্বীয় বিবৃতিতে বলিয়াছেন—আমাকে দিয়া যখন আমার স্ত্রীর শাঁখা ভাঙ্গিয়া ফেলা ও সিন্দুর মুছিয়া ফেলা হয়, তখনকার সেই দৃশ্য দেখিয়া মা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। পূর্ববর্তী সপ্তম অধ্যায়ে রায়পুর থানা হইতে চাঁদপুরে আগত এক পরিবারের গৃহকর্ত্রীর মুখের উপর পাশবিক আক্রমণের চিহ্নের উল্লেখ করিয়াছি। উপদ্রবের প্রথম দিকে বেগমগঞ্জে যে সাময়িক রিলিফ হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণে আক্রান্তা নারীদের শরীরের স্থানে স্থানে দংশনাদির ও তজ্জনিত বিষাক্ত ক্ষতের যে বর্ণনা আছে, তাহা মানুষের চিত্তবৃত্তিকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে।

ঘটনার অব্যবহিত পরের নিম্নলিখিত সংবাদটী হইতে অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবেঃ—

"শিলং, ২১শে অক্টোবর-নোয়াখালি হইতে আগত বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী সমগ্র সুর্মা উপত্যকার বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। তাহাদের অনেকের দেহে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রহিয়াছে—আবার অনেকের সারা দেহ আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের শোচনীয় দুর্দশার কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, নোয়াখালির বহু নারী স্বীয় পবিত্রতা রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়াছে, অনেকে বিষ খাইয়াছে এবং কেহ কেহ গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যাও করিয়াছে।" – আনন্দবাজার পত্রিকা ২৩.১০.৪৬

নারী-নির্যাতন পরিবারবিশেষের বা গ্রামবিশেষের ব্যাপার নহে। উপদ্রুত অঞ্চলে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে ব্যাপকভাবে এবং বিবিধ ও বিচিত্রভাবে। পাশবিক অত্যাচার, বলপূর্ব্বক তথাকথিত বিবাহ, সম্পর্কনিষিদ্ধ তথাকথিত বিবাহ এবং পরিবারের তথাকথিত ধর্মান্তরের পর স্ত্রীলোকদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া—সমস্তই ইহার মধ্যে পড়িবে। [নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রব সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীমলীগ যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন তাহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে মুসলমানদিগের মধ্যে বিলাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহারা এই বলিয়া ইহার দোষ স্খালনের চেষ্টা করেন যে, ইহার পরিবর্তে হিন্দুদিগকে মুসলমান স্ত্রীলোক দেওয়া হইয়াছিল। এই রিপোর্ট তৎকালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। লীগদলের এই স্বীকৃতি হইতেই বোঝা যায়, কিভাবে দুইদিক দিয়া হিন্দুসমাজ ধ্বংস করিবার সুপরিকল্পিত চেষ্টা হইয়াছিল।]

যে সমাজে কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী জ্যেষ্ঠ দেবরের সম্মুখে অবগুণ্ঠন রক্ষা করিয়া চলে, সেই সমাজে কনিষ্ঠের বিধবাকে জ্যেষ্ঠের সহিত তথাকথিত বিবাহ দিবার প্রয়াস বীভৎস অত্যাচার। উৎপীড়কদের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে পিতাকে বাধ্য করা, উৎপীড়িত পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে বা স্ত্রীলোকবিশেষকে রাত্রিযাপনের জন্য বলপূর্বক স্থানান্তরিত করা অথবা উৎপীড়িতদের গৃহে আসিয়া উৎপীড়কগণের রাত্রি যাপন—এই শ্রেণীর অত্যাচার উভয়পক্ষেরই মনুষ্যত্বকে অধোগতির চরম সীমায় নামাইয়া দেয়। যাহারা এই শ্রেণীর অপরাধ অনুষ্ঠান করে, তাহাদের সামাজিক শিক্ষা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে এমন মূলগত ত্রুটি আছে, যাহা তাহাদিগকে সভ্যসমাজে স্থানলাভের পক্ষে অনুপযোগী করে। যে অবস্থায় উচ্চ শাসনকর্মচারীর গৃহে পর্য্যন্ত অপহৃতা নারী রাখা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতে হয়, তাহা সভ্যসমাজ-বিগর্হিত অবস্থার চরম বলিতে হইবে।

মিঃ সিমসনের রিপোর্ট ও মিঃ সুরাবর্দির মন্তব্যঃ

ত্রিপুরা জিলার উপদ্রব সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মিঃ সিমসনকে এবং নোয়াখালি জিলার উপদ্রব সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মিঃ রঞ্জিত গুপ্তকে বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু ত্রিপুরার সম্বন্ধে মিঃ সিমসনের রিপোর্টের যেটুকু আভাস সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয়, নারী-নির্যাতন কার্য্য কি ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, মিঃ সিমসন উপদ্রুত অঞ্চলের একস্থলে ৩০০ এবং অপরস্থলে ৪০০ এই সাত শত পাশবিক অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত কাণ্ডের যাহা ঘটনাস্থল (চর হাইম), আমাদের পরিভ্রমণ প্রসঙ্গে তথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং ঘটনা সম্বন্ধে ভুক্তভোগীদের বিবরণ সাক্ষাৎভাবে আমাদের হাতে আসিয়াছিল। উক্ত স্থানে উপদ্রবের সম্ভাবনা দেখা দিলে, স্থানীয় মাতব্বর সকলকে আশ্বাস দিয়া বলেন, তিনি থাকিতে কোনো উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা নাই এবং হইলেও কাহারও কোন ভয় নাই। যখন উপদ্রবকারীরা দলবদ্ধভাবে প্রায় সন্নিহিত হইয়াছে তখনও তিনি এই আশ্বাস দিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। পরে যখন সত্যসত্যই আক্রমণ ও উপদ্রব আরম্ভ হইল এবং আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণে উপদ্রুত সমাজ বিহ্বল হইয়া পড়িল, তৎকালে মাতব্বর মহাশয় নিজেও দলবলসহ আক্রমণে যোগ দেন। ইতিমধ্যে তিনি কৌশলে

উপদ্রুত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগকে হস্তগত করিয়াছিলেন। আক্রমণ-সম্ভাবনায় উপদ্রুত সম্প্রদায় যখন উদ্বিগ্ন ও বিহ্বল, সেই সময়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়া তিনি তাহাদের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করিতে চাহেন এবং উপদ্রুত সম্প্রদায় ইহাতে সম্মত হয়। এইরূপে স্ত্রীলোকেরা মাতব্বর মহাশয়ের গৃহসম্মুখস্থ প্রাইমারী স্কুলগৃহে স্থানান্তরিত হয়। পরে একদিকে চলিল মাতব্বর মহাশয়ের অধিনায়কতায় অগ্নিদাহ, লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতির উন্মত্ত তাণ্ডব; অপরদিকে চলিল সমস্ত রাত্রি ধরিয়া স্কুলগৃহে অবরুদ্ধ স্ত্রীলোকদের উপর তাহারই পুত্রের অধিনায়কতায় দলবদ্ধভাবে পাশবিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান। জনৈক পুলিশ অফিসার এই মাতব্বর মহাশয়কে গ্রেপ্তার করিতে গিয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন। শুনিতে পাই এই সকল কাণ্ডের উপর মন্তব্য করিয়া মিঃ সিমসন বলিয়াছেন যে, স্থানীয় শাসনকর্মচারীরা উদাসীন না হইলে এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিতে পারিত না। সুতরাং সমূহভাবে তাহাদিগকে অপসারণ না করিলে স্থানীয় অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব। ইহাও শুনিতে পাই, মিঃ সিমসনের এই রিপোর্টের উপর মন্তব্য করিয়া মিঃ সুরাবর্দী বলিয়াছেন, মিঃ সিমসনকে মাত্র রিপোর্ট দিতে বলা হইয়াছিল; কি করিতে হইবে, না হইবে—তাহা লইয়া তাঁহার মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ছিল না। ঘটনার সমসাময়িক শাসনকর্মচারীদিগকে অপসারণ করিবার জন্য যে প্রবল দাবী উত্থাপিত হইয়াছে, উল্লিখিত সংবাদ সত্য হইলে, মিঃ সুরাবর্দী সেই দাবী চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু দাবী বস্তুতঃ চাপা পড়ে নাই।

উপদ্রবের পরিচয় নারীনিগ্রহেঃ

নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রবের পরিচয় কি, প্রকৃতি কি, প্রণালী কি ও উদ্দেশ্য কি,-নারী-হরণ ও নারী-নিগ্রহের দ্বারাই তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। যাহারা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করিয়া ইহার উপর অর্থনৈতিক সঙ্ঘর্ষের ছাপ দিতে চাহেন, তাহাদের দৃষ্টি এই বিশেষত্বের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতেছি। অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব ধনী-দরিদ্রের দ্বন্দ্ব; উহার মধ্যে নারী-হরণ ও নারী-নিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা ও প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিবে? বিশেষভাবে ধর্মসম্প্রদায়গত পরিচয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নারী-হরণ ও নারী-নিগ্রহ যে কার্যপদ্ধতির অন্তর্গত সে কার্যপদ্ধতির প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং পরিচয় যে কি, তাহা কি বলিয়া দিবার প্রয়োজন আছে? উপদ্রবের সকল কাণ্ডের মধ্যে এই প্রশ্নটি বৃহত্তম হইয়া দেখা দিতেছে এবং চিরকালের জন্য বৃহত্তম হইয়াই থাকিবে। ২৬শে নবেম্বর তারিখে আমরা যখন চাঁদপুরে, সেই সময় ত্রিপুরার মুসলমান সমাজের মুসলিম লীগপন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শরৎচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সকল বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে পরিষ্কারভাবে আলোচনা হয়। স্থানীয় মুসলমান নেতৃবৃন্দ নোয়াখালি ও ত্রিপুরার উপদ্রবের সম্ভাবিত সকল প্রকার ব্যাখ্যার কথা উত্থাপন করেন। সমস্ত ধীরভাবে শুনিয়া শরৎচন্দ্র একটি মাত্র প্রশ্ন করেন, হত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, ধ্বংস সমস্তই না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু নারীদের উপর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর তখন পাওয়া যায় নাই এবং এখনও বাকী রহিয়াছে। কখনও পাওয়া যাইবে কিনা জানি না। কিন্তু ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রশ্ন। পূর্বে বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি অপরাধ যত প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নারীহরণ ও নারী নির্যাতনই সর্বাপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ ও সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। মনুষ্যপ্রবৃত্তি যে সত্যসত্যই পাশবিকতার স্তরে নামিয়া গিয়াছিল, উপদ্রবের এই এক অংশই তাহা চূড়ান্তভাবে এবং প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণ করিতেছে। বিস্ময়ের বিষয় ও বেদনার বিষয় এই যে, অপহৃত ও উৎপীড়িত নারীদের উদ্ধার ও রক্ষার জন্য আপনাদের সমস্ত প্রয়াস নিযুক্ত না করিয়া মন্ত্রীরা প্রথম হইতেই ইহা একদম অস্বীকার করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং এবং নোয়াখালি হইতে নির্বাচিত অন্যতম মন্ত্রী মৌলবী আবদুল গফরাণ—উভয়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় স্থানীয় অবস্থা দেখিবার পূর্বেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদের উপর অনুষ্ঠিত উৎপীড়নের দৃষ্টান্ত নাই বলিলেই চলে। সমস্ত দেখিবার শুনিবার পর,

মৌলবী গফরাণের যে বিবৃতি ১৯শে নবেম্বর তারিখে সংবাদপত্রে (Morning News) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদের উপর উৎপীড়নের কোন প্রমাণ তিনি পান নাই।

মন্ত্রীদের আচরণে অপরাধীদের অনুকূলতাঃ

অপহৃত স্ত্রীলোকদের উদ্ধারসাধন এবং পরিবেষ্টিত অঞ্চলে উপদ্রুত সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের উপর উৎপীড়ননিবারণ কার্য্য স্বতঃই দুঃসাধ্য; —কতখানি দুঃসাধ্য তাহা যাহারা আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিয়াছেন, তাহারা সহজেই উপলব্ধি করিবেন। এই দুঃসাধ্য কার্য্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়াছে মন্ত্রীদের বিরুদ্ধ প্রচারকার্যের ফলে। কার্য্যক্ষেত্রে অপরাধ নিবারণে ও দমনে পুলিশ হয় নিষ্ক্রিয়, নয় অসমর্থ এবং প্রকাশ্যে মন্ত্রীরা স্বয়ং ঘটনা অস্বীকার করিবার জন্য এবং মিলিটারীর বিরুদ্ধতায় প্রচারকার্যে নিযুক্ত! উৎপীড়ক ও অপরাধীদের পক্ষে ইহা যে কি সুবর্ণ সুযোগ তাহা কি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে? এই সুযোগ তাহারা নোয়াখালির ধ্বংসকান্ডে পুরামাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। মন্ত্রীদের আচরণের দ্বারা দুই দিক দিয়া অপরাধীদের অনুকূলতা ঘটিয়াছে—মন্ত্রীদের প্রকাশ্য অস্বীকৃতির ফলে অপরাধ চাপা দেওয়ার সুবিধা হইয়াছে এবং মিলিটারীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারকার্যের ফলে অপরাধ নিবারণে ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারে মিলিটারীকে অক্ষম করিয়া রাখা হইয়াছে। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় বলিয়াছি; কিন্তু কেবল নিষ্ক্রিয় বলিলে বোধ হয় ভুল হয়—অপরাধ দমনে নিষ্ক্রিয় সত্যই, কিন্তু একাধিক প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে; তাহাতে অপরাধীদের অনুকূলতায় পুলিশকে বিশেষ সক্রিয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উপদ্রবের অব্যবহিত পরেই প্রথম দিকে মিলিটারীর সাহায্য যথাসময়ে ও উপযুক্তভাবে পাওয়া গেলে উদ্ধারকার্য্য ত্বরান্বিত হইত; দুর্বৃত্তগণ অপহৃতাদের সরাইয়া দিবার অবসর পাইত না; অনেক দুর্ভাগিনী নিগ্রহ হইতে রক্ষা পাইত। কিন্তু তাহা হয় নাই এবং তাহা যে হয় নাই, তজ্জন্য সম্পূর্ণ দায়ী মন্ত্রিমণ্ডল ও তাঁহাদের শাসন। উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক আইন জারী হয় নাই; সুতরাং মিলিটারীর পক্ষে স্বাধীনভাবে বা স্বেচ্ছানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বনের উপায় ছিল না। স্থানীয় শাসন-কর্মচারী ও পুলিশ কর্মচারীদের নির্দেশে তাহাদিগকে চলিতে হইয়াছে। উদ্ধারকার্যের জন্য কোথাও মিলিটারীর প্রয়োজন হইলে পূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের নিকট তাহা জানাইতে ও আবেদন করিতে হইয়াছে। আবেদনের উপরে কর্তৃপক্ষ যাহা নির্দেশ দিয়াছেন, মিলিটারী তদনুরূপ কাজ করিয়াছে। যে-সকল ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ আবেদন মঞ্জুর করেন নাই, সে-সকল ক্ষেত্রে মিলিটারী পাইবার উপায় ছিল না। এই দিক দিয়া ঘটনাসমূহ লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে মিলিটারীকে ব্যর্থ করিয়াছে। এইরূপ আচরণে পুলিশ সাহস পাইয়াছিল মন্ত্রীদের আচরণ হইতে। মন্ত্রীদের উক্তি ও আচরণ মিলিটারীর কার্য্যের হন্তারক হইয়াছে এবং পুলিশকেও হন্তারক হইতে উৎসাহিত করিয়াছে। মিলিটারী লইয়া উদ্ধারের স্থলে পৌঁছিবার পূর্বেই পুলিশ হইতে দ্রুততরগামী ব্যবস্থার দ্বারা অপরাধীকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উদ্ধারকর্মী-মহলে অত্যন্ত পরিচিত ব্যাপার। অপহৃতা নারীদিগকে কেহ বহির্দ্বারে বসাইয়া রাখে না, অন্দরমহলের নিভৃতে যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে গোপন করিবার চেষ্টা করে। সুতরাং অন্দরমহলে তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান না করিলে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই। উপদ্রবের প্রথম দিকে চতুর্দিক যখন জলে পরিবেষ্টিত তখন হইতেই এইরূপ সন্ধান লইবার অধিকার মিলিটারীকে দিলে অপহৃতা ও নিগৃহীতাদের অনেকেরই উদ্ধার সম্ভব হইত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে মিলিটারী পুলিশের অধীন এবং পুলিশ ভিতরে ভিতরে মিলিটারীর বিরুদ্ধগামী,-সেক্ষেত্রে মিলিটারী থাকিয়াই বা কি করিবে? মিলিটারী সন্ধান করিয়া অপরাধীকে ধরিয়া আনিল, অথচ তাহাদেরই মুখের উপর থানা অফিসার অপরাধীদের ছাড়িয়া দিলেন। এরূপ ঘটনা ঘটিলে মিলিটারীর পক্ষে নিরুৎসাহ ও নষ্টচেষ্ট না হইয়া উপায় নাই।

উদ্ধারসমস্যার দৃষ্টান্তঃ

সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধিবশতঃ যখন নারীহরণ ও উৎপীড়ন ঘটে এবং হরণকারী সম্প্রদায়ের সমাজ হইতে যখন সেই অপহরণ ও উৎপীড়নের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, অপরাধীকে সমর্থন করা হয়, অপহরণ ও উৎপীড়ন গোপন রাখিবার চেষ্টা হয়, সেই অবস্থায় অপহৃতার উদ্ধারসাধন যে কি দুঃসাধ্য; তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। ঘটনাটি রংপুরের এবং কয়েক বৎসর পূর্বেকার। একটি অপহৃতা হিন্দু যুবতীর সন্ধানে ও উদ্ধারকার্যে নিযুক্ত বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারীর নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছিলাম। অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু অপহৃতা যুবতীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অপহরণের পর তাহাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে সরাইবার এমন ব্যবস্থা হয় যে, রংপুর সহরের মধ্যে থাকা সত্বেও তাহাকে উদ্ধার করিবার সমস্ত সরকারী চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নিতান্ত বিব্রত হইয়া উক্ত সরকারী ব্যক্তিটি অবশেষে এক কৌশল অবলম্বন করেন। কোন বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর সহরে আগমন উপলক্ষে তিনি চিহ্নিত ব্যক্তিসমূহকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। যে সময়ে প্রধানেরা সকলে ভাজে উপস্থিত এবং ভোজ অনুষ্ঠান চলিতেছে, ঠিক সেই সময়েই তিনি সন্দেহভাজন সমস্ত গৃহে একসঙ্গে তল্লাস করান। গৃহকর্তাদের অনুপস্থিতি এবং আকস্মিক এই তল্লাস—ইহার ফলে অপহৃতা যুবতীকে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও গৃহকর্তারা যাইবার সময়ে অপহৃতাকে গুম করিবার ব্যবস্থা ভালরূপেই করিয়াছিলেন। সন্দেহভাজন একটি গৃহে পুলিশ কোথাও কিছু না পাইয়া অবশেষে ফিরিয়া যাইতেছিল। সহসা কি ভাবিয়া তাহারা গৃহের প্রকাণ্ড ধানের মড়াইয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহার মধ্যেও প্রকাশ্যতঃ কিছুই দেখিতে পায় না; শেষে নীচের মাচার উপরে বুট দিয়া ঘা দেয়। আঘাতের ফলে একটি জায়গা নীচু হইয়া যায় এবং সন্দেহবশে পুলিশ সেই স্থানটি খুলিয়া দেখে সেটি একটি গুপ্তদ্বারবিশেষ। উহার মধ্য দিয়া মাচার নিয়ে অবস্থিত একটি কাঠের সিন্দুক দৃষ্টিগোচর হয়। সিন্দুকটি বাহির করিয়া খোলা হইলে দেখা যায়—অপহৃতা হতভাগিনীকে দোমড়াইয়া উহার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, সিন্ধুকের ডালায় কতকগুলি ছিদ্রের দ্বারা বাতাস যাতায়াতের পথ রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ গৃহকর্তারা বাহিরে যাইবার পূর্বে এইভাবে উহাকে নিরাপদে গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। যুবতীকে যখন বাহির করা হয়, তৎকালে সে মুমুর্ষু, পরে অবশ্য তাহার জীবনরক্ষা হয়। এখন আর তাহার নাম উল্লেখ করিলাম না। নোয়াখালিতে অপহৃতা নারীকে সরাইতে বা গোপন করিতে এত ব্যবস্থা করিতে হইবে না। সন্নিকটেই বিশাল নদী, অভ্যন্তরে জটিল জলপথসমূহ এবং দিবাভাগেও নিবিড় অন্ধকারময় সুপারি-নারিকেলের জঙ্গল। অপহৃতাদের লুকাইবার ও সরাইবার কার্যে ইহা প্রাকৃতিক সহায়।

করপাড়ার চৌধুরীবাড়ী হইতে অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের জন্য ছোট বড় মাঝারি সকল কর্তার নিকট বারবার আবেদন করিয়াও এ পর্যন্ত কোন ফল পাওয়া গেল না। তাহা হইতেই উদ্ধারকার্যের দুরূহত্ব প্রমাণিত হইতেছে। ইহাদের উদ্ধারের বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টার ব্যর্থতাই একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ আলোচনার বিষয়। উদ্ধারকার্য কিরূপ বিঘ্নসঙ্কুল ও বিপৎসঙ্কুল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকজনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিতেছিঃ-

কয়েকটি অভিজ্ঞতাঃ

(১) এক ক্ষেত্রে আক্রান্ত পরিবারবিশেষকে উপদ্রবকারীরা আদেশ করে যে, স্থানীয় মাতব্বরের পুত্রের জন্য তাহাদের সুশ্রী যুবতী কন্যাকে সমর্পণ করিতে হইবে, অন্যথায় সকলকে একসঙ্গে হত্যা করা হইবে। এইভাবে কন্যাটিকে হস্তগত করিয়া উক্ত মাতব্বরের পুত্রের সহিত তাহার তথাকথিত বিবাহ সাধিত হয়। এই যুবতীটিকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীযুক্তা কৃপালনী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাকিনার্ণিকে লইয়া গমন করেন।

মাতব্বরের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহারা যখন যুবতীকে জিজ্ঞাসা করেন, সে চলিয়া আসিতে চাহে কিনা, তাহাতে প্রথমে সে জবাব দেয় যে, সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে। পরে যখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে

দেখাইয়া তাহাকে আশ্বাস দেওয়া হয় যে, মনের কথা খুলিয়া বলিলে তাহার পরিবারবর্গের কাহারও, কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদের রক্ষার জন্য মিলিটারী দিবেন, তখন যুবতী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অবগুন্ঠন ফেলিয়া বাহির হইয়া আসে। উক্ত মাতব্বর ও তাহার পুত্র তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হয়। তাহারা অপরাধীরূপে চৌমুহনীতে আনীত হইলে তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। নারীহরণকারীরা স্বসমাজে কিরূপ প্রশ্রয় পাইয়াছে এই ঘটনা তাহার দৃষ্টান্ত।

[ঘটনাটী রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পাঁচঘরিয়া গ্রামের। কয়েক সহস্র আক্রমণকারী উক্ত গ্রামে 'সুর' পদবীধারী একটি বিশিষ্ট হিন্দু পরিবারের গৃহ ঘেরাও করে। নিকটবর্তী স্থান হইতে বহুসংখ্যক উপদ্রুত হিন্দু পরিবার পূর্বেই এই গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। "লীগ চাঁদা" আদায়, লুন্ঠন, ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতি কার্য্য যথারীতি অনুষ্ঠিত হইবার পর স্থানীয় মাতব্বর লোনি মিঞা প্রস্তাব করেন যে, তাহার পুত্রের সহিত উক্ত গৃহকর্তার কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। প্রত্যেক আশ্রয়প্রার্থী ব্যক্তির এবং উক্ত গৃহকর্তার উপর আক্রমণকারী জনতা 'দাও' উঠাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে এবং স্বীকৃতির জন্য কয়েক মিনিট সময় দেয়। কন্যার পিতামাতা ও পরিজনগণ বলেন যে, প্রাণ গেলেও তাহারা এ প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। তখনই এক বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া যাইত—বহু হিন্দুর শোণিতে আঙ্গিনা ভাসিয়া যাইত। ঠিক সেই মুহূর্তেই কন্যাটী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং আক্রমণকারী জনতার নেতা উক্ত মাতব্বরকে বলে—তোমার পুত্রের জন্য আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি। এই শত শত লোকের হত্যা ঘটাইও না। ইহার পর তথাকথিত বিবাহ সমাধা হইয়া যায়, লোনি মিঞা গরু কাটিয়া দাওয়াত করে এবং কন্যার পিতাকে ভোজে আহ্বান করে। গৃহকর্তা ও তাঁহার পরিবার অর্দ্ধমুর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া থাকেন। এই বালিকাটীকে উদ্ধার করিয়া কলিকাতায় আনা হয়। আনন্দের বিষয়, হিন্দু পরিবারেই তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।]

(২) কুমিল্লার বিশিষ্টা কংগ্রেসসেবিকার অভিজ্ঞতা—কুমিল্লায় সমবেত উৎপীড়িত আশ্রয়প্রার্থী পরিবারের নারীদের সাহায্যে এবং উৎপীড়ন-কাহিনীর উদঘাটনে আত্মনিয়োগ করিয়া এই প্রবীণা দেশসেবিকা বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট শ্রুত একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। একটি অপহৃতা কিশোরীর সন্ধান পাইয়া সরকারী প্রহরী লইয়া তিনি উদ্ধার করিতে যান। সন্দেহভাজন গৃহে একটি কিশোরীকে পাওয়াও যায় কিন্তু সনাক্ত করিবার ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। গ্রামাঞ্চলে সহসা প্রহরীসহ তল্লাসীর আড়ম্বর দেখিয়া পল্লীর অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করিলে উপদ্রবকারী সমাজের ১১/১২ বৎসরের বালকেরা শ্লেষের ভঙ্গীতে বলিতেছিল—"আহা উহাদের বুকের ব্যথা তোমরা কি বুঝিবে!" প্রবীণের বোধ্য ব্যাপারে বালকের মুখের এই শ্লেষ ঘটনার সহিত স্থানীয় সমাজের ব্যাপক যোগ প্রমাণ করে। বালকদের উর্দ্ধতনগণের মন্তব্য বলিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা আর উল্লেখ করিলাম না।

(৩) করপাড়া হইতে অপহৃতা কিশোরীর উদ্ধারের চেষ্টায় অপর একজন বিশিষ্টা মহিলা কর্মী ও কংগ্রেসসেবিকার অভিজ্ঞতা তাহার জনৈক সহযাত্রী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"১৪ই নবেম্বর তারিখে আমাদের rescue party'র নিকট একটি বেনামী চিঠি আসে। পত্রলেখক নিজেকে উক্ত কিশোরীর খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও শুভার্থী বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি লেখেন—কিশোরী পদ্মা গ্রামে বন্দিনী অবস্থায় রহিয়াছে, আপনারা তাহাকে উদ্ধার করুন। জনৈক বিখ্যাত কংগ্রেসসেবিকার সাথে আমরা তৎক্ষণাৎ মিলিটারীর সাহায্য প্রার্থনা করি এবং মিলিটারীসহ উক্ত গ্রাম অভিমুখে রওনা হই।

পথের দুধারে প্লাবন। জলের উপরে অজস্র ধান্যের শীষ উঁকি দিতেছে। গ্রাম গ্রামান্তরের ঘন-সন্নিবিষ্ট সুপারিবন একটা অদ্ভুত রহস্যে গ্রামগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

অকস্মাৎ একটা অদ্ভুত চীৎকার আমাদের কাণে আসিল—মানুষেরই চীৎকার তবে বোধগম্য ভাষায় নহে। স্থানীয় একজন সঙ্গী বলিলেন— ইহা সতর্ক হইবার সঙ্কেত। চাহিয়া দেখিলাম সুপারি বন হইতে একটি দুটি করিয়া মানুষ উঁকি মারিতেছে। এইমাত্র যে সঙ্কেতধ্বনি অখণ্ড নীরবতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল, পরক্ষণেই তাহা গ্রাম গ্রামান্তরকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। অসংখ্যকণ্ঠে। যত দূর যাই একই ধ্বনি।

প্লাবনোচ্ছল ধানবনের পরপার হইতে সুপারিবনের নিবিড়তায় শিকারী মানুষের সতর্ক চাহনি - অলক্ষ্যে জাগিয়া ওঠা দুর্বোধ্য ভাষার চীৎকার—আর নিরবচ্ছিন্ন জনহীনতা। জিজ্ঞাসা করিলাম স্থানীয় লোকেরা কোথায় গেল?

সঙ্গী ঈষৎ হাস্যে সুপারিবনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম ওখানে কেন?

সঙ্গী নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, ইহাই রীতি; সঙ্কেতধ্বনি পাওয়া মাত্রই গ্রেপ্তারের ভয়ে উহারা আত্মগোপন করে।

সত্যই তাই। পদ্মার ঘরে ঘরে প্রাচুর্য; আধপোড়া লুন্ঠিত টিন— লুন্ঠিত আসবাবের সমারোহ—প্রমাণ না থাকিলেও নবাগতের চোখে মুহূর্তে ধরা পড়ে এইসব প্রাচুর্যের কারণ। কিন্তু বয়স্ক পুরুষ একটিও গ্রামে নাই। বহুক্ষণ অনুসন্ধান চলিল; যে বিখ্যাত কংগ্রেসসেবিকার সহিত আমরা গিয়াছিলাম, তিনি অন্তঃপুরচারিণীদের নিকট অনুসন্ধান করিলেন।

অবশেষে জেরার ফলে স্থানীয় সমাজের কয়েকজন নারী এবং কয়েকটি বালক-বালিকা স্বীকার করিল যে, কিশোরী সেই গ্রামেই ছিল; যে গৃহে ছিল তাহাও একটি বালক দেখাইয়া দিল এবং বলিল আমাদের আসিবার সংবাদ পাইয়াই তাহাকে বলপূর্বক সুপারিবনে সরানো হইয়াছে। আড়পাঁজা করিয়া টানিয়া লইবার সময় কিশোরী চীৎকার করিয়া কঁদিতেছিল। বালকটি মনে করিয়াছিল সে ক্রন্দনধ্বনি আমাদেরও কানে গিয়াছে। যে সুপারিবনে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহাও সে দেখাইয়া দিল। নোয়াখালির সুপারিবন যিনি দেখেন নাই, তাহার পক্ষে বুঝিয়া ওঠা কঠিন - কেন তাহা মানুষের অগম্য। সেখানে কেহ লুকাইলে দিনের পর দিন খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

অপহৃতাকে পাওয়া গেল না।

এই তল্লাসীর ফলে লীগদলভুক্তগণ আমাদের বিরুদ্ধে নানা অমূলক অভিযোগ করে। রাত্রে ক্যাম্পে ফিরিয়া পুনরায় escort-এর আয়োজন করিতে Lt. Alton এর সহিত দেখা করিতে যাওয়া হইল।

অলটন বলিলেন,

You have broken our confidence and have misused our help. Your conduct has given rise to numerous protests. I can't help you. (পরে অবশ্য মিলিটারী আবার পাওয়া গিয়াছিল, তবে অত্যন্ত কষ্টে)।”

লক্ষ্য করিবার বিষয় করপাড়া গৃহ হইতে অপহৃতা অপর একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে এই পদ্মা গ্রামের নিকটেই পথে অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গিয়াছিল।

(৪) চতুর্থ ঘটনা কুমিল্লার জনৈক অধ্যাপকের পত্নীর অভিজ্ঞতা –

গৃহবিশেষে অপহৃত নারী রহিয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি প্রহরীসহ উদ্ধারার্থে গমন করেন। নির্দিষ্টগৃহে পৌঁছিয়া দেখিতে পান, যে পুলিশ অফিসারের নিকট আবেদন করিয়া তিনি সশস্ত্র প্রহরী লইয়াছিলেন সেই অফিসারটি তাহার পূর্বেই সন্দেহভাজন গৃহে পৌঁছিয়া রহিয়াছেন। পুলিশ অফিসারটিকে এমন সাত তাড়াতাড়ি তথায় আসিবার কারণ তিনি জিজ্ঞাসা করিলে অফিসারটি জবাব দেন যে, অন্য একটা ঘটনার তদন্তের জন্য তাঁহাকে ঐ অঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। সেই উপলক্ষেই তিনি ঐস্থানে গিয়া

পৌঁছিয়াছেন। অপহৃতা নারীটিকে অবশ্যই পাওয়া যায় নাই। পুলিশ ও চৌকিদারের যোগসাজসে এইরূপ কত উৎপীড়ন, অপহরণ ও অপসারণ যে ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার উপর মুসলিম লীগের সুগঠিত ও সুসজ্জিত গুপ্তচরবাহিনী পূর্ব হইতেই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে থাকিয়া দূত লাগাইয়া ও সঙ্কেতধ্বনির দ্বারা পুলিশ ও মিলিটারীর আগমন সংবাদ জানাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে।

(৫) উল্লিখিত ঘটনাসমূহ ছাড়া আর একটি ঘটনা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের গোচরে আসিয়াছিল। কিভাবে আসিয়াছিল তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। ঘটনাটি চরমণ্ডলের; উপদ্রব আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বের।

স্থানীয় প্রভাবশালী এক তালুকদার পিতৃহীনা এক বালিকাকে মাতার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়। তালুকদার মহাশয়ের পূর্ব্বগৃহীত তিন পক্ষ বর্তমান। এই শেষোক্ত বালিকাটিকে তাঁহার চতুর্থ ভোগ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বালিকাটির আত্মীয়স্বজন বিশেষভাবে উৎপীড়িত ও উপদ্রুত হইয়াছে এবং আরও উপদ্রবের ভয়ে বালিকার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না, জিজ্ঞাসা করিলেও বলিতে চাহে না। বালিকাটির পরিচয় স্থানীয় কর্মীদের নিকট দিয়া আসিয়াছিলাম। উদ্ধার হইয়াছে কি না, জানি না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেরূপ ভয়সঙ্কুল, তাহাতে শাসন-কর্তৃপক্ষের বিশেষ সহায়তা না পাইলে তাহার উদ্ধার অসাধ্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপে এই যে কয়টি ঘটনার উল্লেখ করা হইল, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে - অপহৃতা নারীদের সন্ধান ও উদ্ধারসাধন কতখানি বিঘ্নসঙ্কুল।

নিশ্চিত বিবরণ নাইঃ

যে সকল অপহৃতা এখনও দুর্বৃত্তদের কবলে রহিয়াছে তাহাদের সংখ্যা কয়েকশত হইবে বলিয়া অনুমান। ইহাও অনুমান যে, অপহৃতাদের অনেককেই চট্টগ্রামে ও মেঘনার অপর পরবর্তী বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ইহাদের উদ্ধার কখনও সম্ভব হইবে কিনা এবং উপদ্রবকালীন ও তৎপরবর্তী নারী নির্যাতনের পূর্ণবিবরণ কখনও উদঘাটিত হইবে কিনা জানি না। (কুমিল্লায় সমবেত নিগৃহীত নারীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য। যে অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি মুসলমান এবং অন্যতম মন্ত্রী মৌলবী আব্দুল গফরাণ মহাশয়ের জামাতা)। ইহা নিশ্চিত যে, উদ্ধার সমস্যার প্রতি সকলের একাগ্র অভিনিবেশ এবং প্রভূত পরিশ্রম ব্যতীত অপহৃতাদের উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ হইতে অবস্থাটা কিছু বোঝা যাইতে পারেঃ

(১) "এলাহাবাদ ৩রা জুলাই-তিন মাস পূর্বে নোয়াখালি হইতে অপহৃতা একটি তরুণীকে অদ্য সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে সি শুক্লের আদালতে উপস্থিত করা হইয়াছে। এলাহাবাদ কোতোয়ালী থানার বাসিন্দা শ্রীযুক্তা অনিমা মুখার্জি সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্মে এক আবেদন করেন যে, নোয়াখালি জেলার রাণী মুখার্জিকে জোহারা নামে স্থানীয় ডাফরিণ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। আবেদনে একথাও উল্লেখ করা হয় যে, বালিকাটি শ্রীযুক্তা অনিমা মুখার্জির নিকট বলিয়াছে যে, সে নোয়াখালির একটি মুখার্জি পরিবারের লোক এবং তাহার বাড়ীঘর সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের গুণ্ডারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে। বালিকাটি ইহাও বলে যে, তাহাকে নোয়াখালি হইতে অপহরণ করা হয় এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সিদ্দিকি নামক এক ব্যক্তি তাহাকে আটক রাখে।

বালিকাটিকে আদালতে হাজির করা হইলে, সে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক জবানবন্দী দিয়াছে। আদালতে জবানবন্দী দিবার কালে বালিকাটি শ্রীযুক্তা অনিমা মুখার্জির আবেদনে লিখিত বিষয়গুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বালিকাটি বলিয়াছে যে, তাহার পিতামাতাকে হত্যার পর তাহাকে হাওড়া লইয়া আসা হয়। হাওড়া হইতে তাহাকে চৈত্র মাসে বোরখা পরিহিত অবস্থায় এলাহাবাদে আনা হয়। এ সময়ের মধ্যে ৮ জন লোক তাহাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। যে লোকটি তাহাকে নোয়াখালি হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, সে লোকটির নামও সে প্রকাশ করিয়াছে। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই মামলা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য পুলিসকে নির্দেশ দিয়াছেন। তদন্ত সাপেক্ষে বালিকাটিকে কোন বাঙ্গালী পরিবারে অথবা সম্ভব হইলে শ্রীযুক্তা অনিমা মুখার্জির হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যে লোকটি তাহাকে অপহরণ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহাকেও গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। -ইউ, পি।" আনন্দবাজার পত্রিকা (৫/৭/৪৭)

(২) "ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট; ১৮ই জানুয়ারী-নোয়াখালির হাঙ্গামার সময় তথা হইতে অপহৃত চারিজন হিন্দু বালিকাকে পাঞ্জাবের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার সময় মুসলমানদের গৃহ হইতে উদ্ধার করিয়া স্থানীয় নিউটন হাসপাতালে স্ত্রীলোকদের আশ্রয়শিবিরে রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে সেক্রেটারী, নিউটন হাসপাতাল, ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্ট-এই ঠিকানায় পত্রালাপ করা যাইতে পারে।" আনন্দবাজার পত্রিকা ৫/২/৪৮

উপদ্রবের বিবরণে দেখা গিয়াছে যে, উপদ্রবকারীরা হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, ধর্মনাশ ও নারীহরণ এই পাঁচপ্রকার বিভাগ অনুসারে কাজ করিয়াছে। যাহারা প্রত্যক্ষ নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড দেখিয়াছে, তাহারা বলে, নারীহরণ কার্যটি বিক্ষিপ্তভাবে হয় নাই, দলবদ্ধভাবে এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধিত হইয়াছে। যে সকল উপদ্রুত পরিবার একেবারেই উৎসন্ন হইয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিবরণ পাইবার উপায় নাই; যাহারা স্থানে বা নিকটে আছে তাহারাও সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে চাহে না। যে সকল পরিবারের পুরুষেরা হত্যার ফলে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ জানাইবার কেহ নাই। হত্যার ফলেই হউক, উৎসন্ন ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলেই হউক অথবা প্রকাশবিমুখতার জন্যই হউক অপহৃতা নারীদের সঠিক সম্পূর্ণ বিবরণ পাইবার কোন উপায় নাই। উপদ্রবের সময় সহসা আক্রান্ত হইয়া লোক এমন অভিভূত হইয়াছিল যে তৎকালে গৃহে কাহারা উপস্থিত ছিল সে সম্বন্ধেও অনেকের ভ্রান্তি ঘটিয়াছে। হত্যার ফলে প্রায় নিশ্চিহ্ন এক বৃহৎ পরিবারের কোনমতে রক্ষাপ্রাপ্ত একটি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরিবারের বিভিন্ন হিস্যায় সে কালরাত্রিতে কয়জন এবং কাহারা উপস্থিত ছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, যুবকটি ঠিক বলিতে পারিল না। সে যে হিসাব দিল, তাহার প্রতিবেশীরা হিসাব দিল তাহা অপেক্ষাও অধিক। দৃষ্টান্তস্বরূপে একজন প্রতিবেশী বলিল—এক হিস্যায় পূর্ব্বদিন গৃহকর্তার জামাতা অসিয়াছিল; যুবকটি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থায় নারীহরণের সঠিক সংবাদ পাইবার আশা রাখি না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই - যে কয়টা সঠিক জানা গিয়াছে, তাহাদেরও সবগুলি উদ্ধার সম্ভব হইল না।

মহিলাকর্মীদের মনোযোগ প্রয়োজনঃ

আরও দুঃখের বিষয় এই,—একমাত্র শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী ব্যতীত অপর কোন মহিলাকর্মী নোয়াখালিতে থাকিয়া উদ্ধারের কার্য্যে সমগ্রভাবে আত্মনিয়োগ করেন নাই। অন্যান্য পরিচিত মহিলাকর্মী যাহারা গিয়াছেন, সকলেই কয়েকদিনের অভিযাত্রী। কিছু কিছু ঘুরিয়া সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিয়াছি, গান্ধীজী ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও কাহাকেও থাকিয়া যাইতে এবং প্রয়োজনানুরূপ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গান্ধীজীর অনুরোধও ফলপ্রসূ

হয় নাই। বিশিষ্ট মহিলাকর্মী বলিয়া যাহারা প্রখ্যাত তাহারা প্রথম হইতে থাকিয়া কার্য্য করিলে এতদিনে উদ্ধারকার্যে প্রভূত সহায়তা হইত। উপদ্রুতদের সেবাকার্য্যের প্রসঙ্গে যাহারা উপদ্রুত অঞ্চলে যাতায়াত বা সাময়িকভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাদের কথাও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সমস্যার গুরুত্ব ও ব্যাপকতা বিচার করিয়া মাত্র যাতায়াতে বা সাময়িক সেবায় ইহার প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই। ইহার জন্য প্রয়োজন ছিল – দীর্ঘকাল স্থায়িভাবে থাকিয়া উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরভাগে কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া। সমগ্র অঞ্চলকে কতকগুলি এলাকায় ভাগ করিয়া এক বা একাধিক মহিলা কর্মী এক এক এলাকা লইয়া কাজ করিতে পারিতেন। অভ্যন্তরভাগে মিলিটারী থাকিতে থাকিতে ইহা করিলে কাজও অনেক সহজসাধ্য হইত। এখন মিলিটারী অপসারণের পর উদ্ধারকার্যের জন্য বেসরকারী তরফ হইতে কি প্রণালী অবলম্বিত হইবে তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। শাসকগণ অনুকূল হইলে বলিতাম পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের একটা বিশেষ অংশ এই কার্যের জন্যই নিযুক্ত করিয়া বেসরকারী প্রয়াসের সাফল্যবিধানে সহায়তা করিতে। কিন্তু বলিব কাহাকে?

(২৪.১.৪৭. ও ১.২.৪৭)

একাদশ অধ্যায়ঃ

নারীহরণ—জননীর মর্ম্মবেদনাঃ

নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ডে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পর দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম গত ১৯শে নবেম্বর তারিখে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে অন্যতম মন্ত্রী মৌলবী আবদুল গফুরাণ বলিয়াছেন,–

মন্ত্রীর অপপ্রচারঃ

"No case of abduction was reported to me throughout my tour in the interior." - "জেলার অভ্যন্তরভাগে পরিভ্রমণের সময়ে কেহ আমার নিকট কোনো নারীহরণের সংবাদ জানায় নাই।"

ঘটনার প্রথম হইতেই উহা যথাসাধ্য উড়াইয়া দিবার ও লঘু করিবার যে কৌশল মন্ত্রীরা অবলম্বন করিয়াছিলেন মৌলবী গফরাণের উক্তি তাহার সহিত সঙ্গতই হইয়াছে। কিন্তু এই বিবৃতিতেই অন্যত্র তিনি বলিয়াছেনঃ

"Rajendra Babu's surviving family members were his wife, two daughters, and a son. Many other women and children of his house were living in their relatives' house just close to Rajendra Babu's. From here I removed 20/21 ladies and children in two boats to give them safe conduct." এই উক্তিটির মধ্যে কতটা সত্য গোপন আছে এবং কতটা সত্যের বিকৃতি আছে, তাহা আপাততঃ ধরিতেছি না। মন্ত্রী মহাশয় – বলিতেছেন, করপাড়ার হত্যাকাণ্ডের পর রাজেন্দ্রলাল রায়ের পরিবারের নারী ও শিশুসন্তানগণকে উদ্ধার করিবার কৃতিত্ব তাহারই। কিন্তু এই পরিবারেরই একটি যুবতী বধূ, একটি কিশোরী ও একটি বালিকা কন্যা (শেষোক্তটিকে পরে পদ্মাগ্রামে ঘটনাচক্রে পাওয়া গিয়াছে) যে অপহৃতা হইয়াছে, তাহা মন্ত্রী মহাশয়ের গোচর হয় নাই ইহা কি সম্ভব?

মন্ত্রী মহাশয়ের এই শ্রেণীর বিভ্রান্তিজনক প্রচারকার্যের প্রতিকারার্থে করপাড়া পরিবার হইতে অপহৃতা বধূ ও কিশোরীর কথা একটু সবিশেষে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। ইহার মধ্যে কিশোরীর অপহরণের ঘটনাটিই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বেশী। কিশোরীর বয়স ১৪/১৫, বধূটির বয়স ২৪/২৫। অপহরণের সময় বধূটি ৫ মাসের অন্তঃসত্বা ছিল। নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রব নারীহরণের এ দুইটি সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত।

নারীহরণের আরও দুইটি সুনির্দিষ্ট ঘটনা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

(১) বাঙলা গবর্ণমেন্টের পুলিশ বিভাগের জনৈক কর্মচারী উপদ্রবের সময় ছুটী লইয়া রামগঞ্জ থানার অধীন রাজারামপুর গ্রামে ছিলেন। তাঁহাকে লইয়া তাহার পরিবারের ১ জন পুরুষকে হত্যা করা হয়। তাহার ১৫/১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা (ইংরাজী স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী) বলপূর্বক অপহৃত হয়।

(২) লক্ষ্মীপুর থানার দালালবাজার গ্রাম নিবাসী জনৈক রাজবন্দীর গৃহের দুইজন পুরুষ (তাহার পিতা ও ভ্রাতা) নিহত হয় এবং দুই ভগিনী অপহৃত হয়। লক্ষ্মীপুর গ্রামে এক মুসলমানের সহিত বলপূর্বক বিবাহ দিবার উদ্যোগের সময়ে একটীকে উদ্ধার করা হয় ; অপরটীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ইঁহাদের উদ্ধার করিবার জন্য এ পর্যন্ত সমস্ত প্রয়াসের ব্যর্থতাই নোয়াখালি-ত্রিপুরার উপদ্রুত অঞ্চলে অপহৃতা নারীর উদ্ধার-সমস্যার স্বরূপ প্রকটিত করিয়াছে। ইহারা সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারী। ইঁহাদের আত্মীয়দিগের মধ্যে যাঁহারা উপদ্রুত অঞ্চলের বাহিরে থাকায় রক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী। এই অবস্থায় ইঁহাদের সন্ধান ও উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞাত, অখ্যাত দরিদ্র পরিবারের অপহৃতা নারীদের কি অবস্থা। ঘটিয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রধান মন্ত্রীর নিকট জননীর আবেদনঃ

অপহৃতা কন্যার উদ্ধার প্রার্থনা করিয়া তাঁহার বিধবা জননী বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দীর নিকট গত ২৫শে নভেম্বর যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত; নারী হরণের বিবরণ আলোচনাপ্রসঙ্গে সেই পত্র উল্লেখযোগ্য—

"আমার নাম শ্রীবীণরাণী রায় চৌধুরী, নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত করপাড়া গ্রামে আমার বাস। সাম্প্রতিক সময়ের বিপর্যয়ের ন্যায় কতগুলি ঘটনা এই গ্রামে ঘটায়, এই গ্রাম ইতিমধ্যেই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। গত ১১ই অক্টোবর রাত্রে উচ্ছৃঙ্খল দুর্ব্বৃত্তের দল আমার বক্ষ হইতে আমার কুমারী কন্যা নমিতা রায় চৌধুরীকে বলপূর্বক ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। আমার কন্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করিবার কালে আমি কপালে গুরুতর আঘাত পাই। এই সময়ে আক্রমণকারী দুর্বত্তের দল যে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। আমি রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায়ের পরিবারভুক্ত। উচ্ছৃঙ্খল জনতার আক্রমণের ফলে রায় সাহেব রাজেন্দ্রলাল রায় চৌধুরীর জীবনান্ত হয়।

আমি ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে চাহি না। আমি ইতিপূর্বেই ঘটনার বিশদ বিবরণ যথাস্থানে পেশ করিয়াছি। আপনার অবগতির জন্য সেই বিবরণের একখণ্ড এই আবেদনের সহিত পাঠাইতেছি।

ইতিহাস সম্পর্কে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু তবুও আমি বলিতে পারি যে, নোয়াখালিতে উচ্ছৃঙ্খল জনতা যে পৈশাচিক কার্যাদির অনুষ্ঠান করিয়াছে, স্মরণকালের মধ্যে সেরূপ ঘটনা ঘটে নাই। এই ধরণের কোন ঘটনা আমার মা, ঠাকুমার নিকটেও শুনি ......

**** গভীর দুঃখের সঙ্গে পাঠকদের জানাচ্ছি যে, তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক তথা সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য রচিত "নোয়াখালির ধ্বংসকান্ড" এর পরের পাতাগুলি আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। অতএব আমাদের এই পর্বটি এখানেই সমাপ্ত রাখতে

বাধ্য হলাম। যদি অদূর ভবিষ্যতে বাদবাকি পাতাগুলির কোনও রকমের সন্ধান পাওয়া যায়, তা তৎক্ষণাৎ আপনাদের গোচরে আনবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রইলাম। ****